মাসুদ রানা

নরপিশাচ

তিনখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

ওরা তাকে বর্বর অচিন্ত্যনীয় পদ্ধতিতেই খুন করেছে। ঠিক যেভাবে [illegible] ও [illegible] শত্রু [illegible] পরাজিত উপজাতির শিশুসন্তানদের খুন করত। [illegible] মাসুদের দুই গোড়ালি শক্ত করে ধরে পাঁচিলে বাড়ি মেরে খুলি ফাটিয়েছে, পাঁচিলের সাদা গায়ে মগজ লেগে রয়েছে এখনও।

ছোট্ট লাশটার উপর ঝুঁকে রয়েছে রানা। খুলি চুরমার হলেও [illegible] সঙ্গে চেহারার মিলটা পরিষ্কার ধরা যায়। রানার চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে, ধীরে ধীরে সিধে হলো ও।
ভাইটির চেয়ে বোন দুটো বয়সে বড়। [illegible] বয়স দশ, [illegible] আট। বিছানার পায়ের দিকটায় নগ্ন পড়ে আছে ওরা, রক্তাক্ত দু'জনকেই বারবার ধর্ষণ করা হয়েছে।
ফোঁপাচ্ছে রানা। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, তবু [illegible] কথাগুলো উচ্চারণ করে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা [illegible] 'এর জন্যে যে বা যারাই তোমরা দায়ী হও, তোমাদের [illegible] লেখা আছে আমার হাতে। কসম খোদার!'

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী: ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা [illegible]: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি [illegible]: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

নরপিশাচ

কাজী আনোয়ার হোসেন

তিনখণ্ড একত্রে

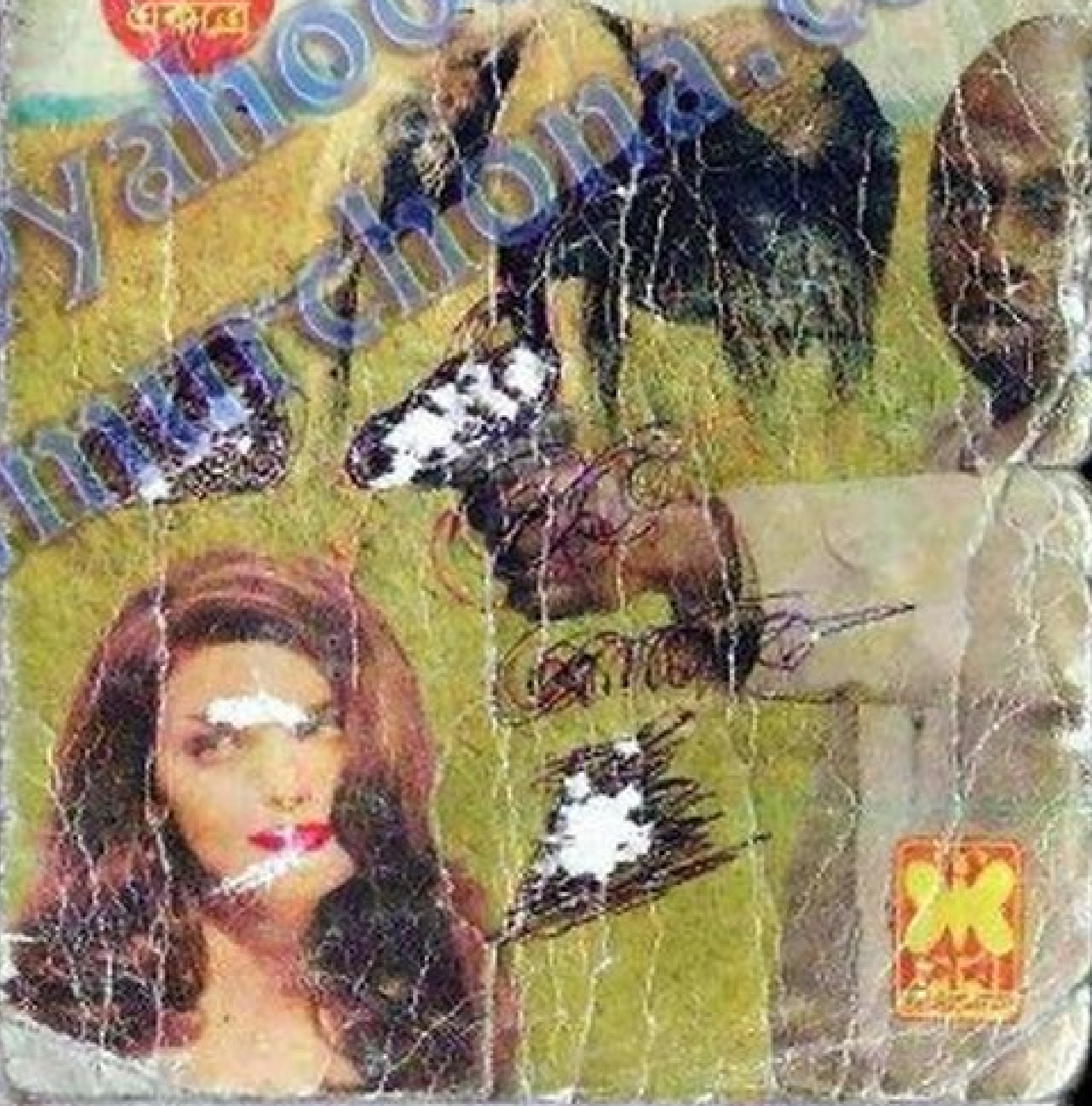

aminsumon@yahoo.com
http://www.murchona.com

A Few Modifications Done

Cdedit Goes To:
ORIGINAL UPLOADER~~(heck i don't know the name)~~

Feel Free To Share

নরপিশাচ-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

এক

বনভূমির চারদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি বুলাল মাসুদ রানা। মনের কোণে উঁকি দিয়ে গেল কিছু মধুর ও তিক্ত স্মৃতি। এই অরণ্যের প্রতিটি গাছ, প্রতি ইঞ্চি মাটির সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে। এখানে শিকার করেছে ও, যুদ্ধও করেছে। হারিয়েছে অনেক প্রিয় বন্ধুকে, তেমনি ওর হাতে মারা পড়েছে মানুষ নামের দ্বিপদ কয়েকটা পিশাচ।

জিম্বাবুই, চিউইউই ন্যাশনাল পার্ক।

লম্বা একটা বিল্ডিঙের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। পার্কের ট্রেজার হাউস বলা হয় এটাকে। ভারি প্যাডলকে চাবি ঢুকিয়ে দরজা খুলল চিউইউই ন্যাশনাল পার্কের চীফ ওয়ার্ডেন আলি শাহ। রানার কনসেশন লাইসেন্স বাতিল হবার আগে আলি শাহ ছিল ওর ট্র্যাকার ও গানবেয়ারার। প্রাণচঞ্চল ম্যাটাবেল তরুণ, কয়েকশো ক্যাম্পফায়ারের আলোয় রানার কাছে ইংরেজি লিখতে ও বলতে শিখেছে। পরে নিজের চেষ্টায় ও রানার খরচে ম্যাট্রিক, আইএ ও বিএ পাস করে সে। একটা সময় ছিল, সারাটা দিন গভীর অরণ্যে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে চেপে ঘুরে বেড়াত ওরা। মাঝখানে অনেকগুলো বছর দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও যোগাযোগ ছিল, ফলে ওদের বন্ধুত্বে এতটুকু মরচে ধরেনি।

এবার আফ্রিকায় এসেছে রানা সম্পূর্ণ নতুন এক ভূমিকা নিয়ে। এর আগে হয় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে নয়ত ছুটি কাটাবার জন্যে এসেছে। এবারের আসার সঙ্গে ওর পেশার কোন সম্পর্ক নেই। পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা সম্পর্কিত সচিত্র তথ্য সংগ্রহ করছে ও। এটা ওর নতুন একটা হবি বা শখ। নেচারালিস্ট হিসেবে সারা দুনিয়ার টিভি দর্শকদের কাছে এরইমধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে ও। পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার পক্ষে বিশ্ব জুড়ে যে যুদ্ধটা শুরু হয়েছে, সেটাও কম রোমাঞ্চকর বা কম বিপজ্জনক নয়। আর তাছাড়া, ঢেঁকি তো স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে।

গুদামের ভেতর আলো খুব কম। তারপরও যা দেখল, চোখ বড় হয়ে উঠল রানার। মৃদু শিস দিল ও, বলল, 'করেছ কি হে, আলি! পার্কের সব হাতি দেখছি মেরে সাফ করে ফেলেছ!'

গুদামের ভেতর মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সাজানো রয়েছে হাতির দাঁত-আইভরি। কত দাম হবে আন্দাজ করা কঠিন। ক্যামেরাম্যানের দিকে তাকাল রানা, বলল, 'আলোর ব্যবস্থা করো দেখি, পরিষ্কার ছবি চাই আমি।'

সামনে বাড়ল ক্যামেরাম্যান, কোমরে ভারি ব্যাটারি প্যাক জড়ানো থাকায় কুঁজো হয়ে আছে। হাতের আর্ক ল্যাম্প অন করল সে। তীব্র নীলচে-সাদা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভেতরটা।

'পল, ওয়্যারহাউসের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত আমাকে আর ওয়ার্ডেনকে অনুসরণ করবে তোমার ক্যামেরা,' নির্দেশ দিল রানা। মাথা ঝাঁকিয়ে আরও সামনে চলে এল ক্যামেরাম্যান, কাঁধে সনি ভিডিও রেকর্ডার। পল নিউম্যানের বয়স রানার কাছাকাছি, আটাশ। পরনে খাকি শর্টস শুধু, পায়ে খোলা স্যান্ডেল। জাম্বেজি উপত্যকার গরমে তার খালি গা ঘামে চকচক করছে। মাথায় মেয়েদের মত লম্বা চুল, ঘাড়ের পিছনে রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধা। দেখে মনে হবে পপ স্টার, তবে সনি ক্যামেরা হাতে থাকলে সে সত্যিকার একজন উঁচুদরের শিল্পী। প্রথমে আইভরির ছবি নিল সে, তারপর রানার ওপর স্থির হলো ক্যামেরা।

'আইভরি,' শুরু করল রানা, 'সেই ফেরাউনদের যুগ থেকে, দুনিয়ার অন্যতম সেরা প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।' রানার পাশে চলে এল চীফ ওয়ার্ডেন আলি শাহ। 'এই সাদা সোনা সংগ্রহের জন্যে দু'হাজার বছর ধরে হাতি শিকার করছে মানুষ,' বলে চলেছে রানা। 'তারপরও, মাত্র এক দশক আগেও, আফ্রিকা মহাদেশে হাতি ছিল বিশ লাখ। এখন, দশ বছর পর, হাতির সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দশ লাখে। দশ বছরে মেরে ফেলা হয়েছে দশ লাখ হাতি। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। এটা ঘটল কিভাবে? সেই কারণটা জানার জন্যেই আমরা এখানে এসেছি। সেই সঙ্গে আমরা আরও জানার চেষ্টা করব কি করলে আফ্রিকান হাতিকে নিশ্চিহ্ন হবার বিপদ থেকে রক্ষা করা যায়।' এরপর চিউইউই ন্যাশনাল পার্কের চীফ ওয়ার্ডেন আলি শাহের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল রানা। 'চীফ ওয়ার্ডেন, এই মুহূর্তে আপনার স্টোর রুমে ক'টা হাতির দাঁত রয়েছে?'

'প্রায় পাঁচশো-চারশো ছিয়াশিটা। প্রতিটির গড়পড়তা ওজন সাত কিলো।'

'প্রতি কিলো তিনশো ডলার। তারমানে এগুলোর দাম এক মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। এ-সব কিভাবে পেলেন আপনি?'

ভারি গলায় জবাব দিল আলি শাহ। কিছু আইভরি সংগ্রহ করা হয়েছে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত হাতি থেকে। কিছু উদ্ধার করা হয়েছে পোচারদের কাছ থেকে। তবে বেশিরভাগ সংগ্রহ করা হয়েছে কালিং অপারেশনের মাধ্যমে।

গুদামের শেষ মাথায় পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল ওরা। 'আপনাদের কালিং অপারেশন সম্পর্কে পরে আলোচনা করব, মি. শাহ। তার আগে আপনি আমাদেরকে পোচিং সম্পর্কে বলুন। পরিস্থিতি কতটা খারাপ?'

শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে জবাব দিল চীফ ওয়ার্ডেন। 'কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া ও জাম্বিয়ার হাতি শেষ করার পর পোচাররা এখন জিম্বাবুইয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে। দেখামাত্র গুলি করে তারা–হাতি, গণ্ডার, মানুষ–যাকে সামনে পায়। বাধ্য হয়ে আমরাও তাই করছি, দেখামাত্র গুলি করি পোচারদের।'

ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে চিউইউই পার্কের করুণ অবস্থার বিশদ বর্ণনা দিল রানা। শেষে বলল, 'আফ্রিকার হাতি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হলো, আফ্রিকাও কি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে?' সচিত্র প্রতিবেদনের প্রথম পর্ব শেষ হতে সময় লাগল বিশ মিনিট।

দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে রানা প্রশ্ন করল, 'জিম্বাবুইয়ে মোট কত হাতি আছে? তারমধ্যে চিউইউইয়ে ক'টা?'

আলি শাহ জানাল, 'জিম্বাবুইয়ে হাতি আছে প্রায় বাহান্ন হাজার। চিউইউইয়ের হিসেবটা আরও নিখুঁত দিতে পারব আমরা। মাত্র তিন মাস আগে জরিপ চালিয়েছি। এখানে হাতি আছে আঠারো হাজার।'

'শুধু চিউইউইয়ে এত হাতি? নিশ্চয়ই আপনারা গর্ববোধ করেন?'

ভুরু কুঁচকে চেহারা বিষণ্ণ করে তুলল চিফ ওয়ার্ডেন। 'না, মি. মাসুদ রানা। আমরা গর্বিত তো নইই, এই সংখ্যা নিয়ে বরং উদ্বিগ্ন।

'ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবেন, প্লীজ?'

'এক কথায়, এত বেশি হাতি পোষা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। আমাদের হিসেবে, জিম্বাবুইয়ের জন্যে ত্রিশ হাজার আদর্শ সংখ্যা। মাত্র একটা হাতির জন্যে প্রতি দিন দরকার এক টন ভেজিটেবল। এই খাবার পাবার জন্যে এমন সব গাছ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে সে, যেগুলোর বেড়ে উঠতে সময় লেগেছে কয়েকশো বছর।'

'হাতির সংখ্যা আরও যদি বাড়তে দেন, কি ঘটবে?'

'অল্পদিনের মধ্যেই চিউইউই পার্ককে ধুলোর একটা পাত্রে পরিণত করবে তারা। তারপর খাদ্যের অভাবে সবগুলো মারা যাবে। কিছুই থাকবে না আমাদের–না হাতি, না গাছ, না পার্ক।'

'এর সমাধান কি, ওয়ার্ডেন?' মৃদুকণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'সমাধান আছে,' বিষণ্ণ সুরে বলল আলি শাহ। 'তবে সেটা অত্যন্ত তিক্ত ও করুণ।'

'কি সেটা?'

'চাইলে নিজের চোখেই সমাধানটা দেখতে পারেন আপনি, মি. রানা। তবে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, দৃশ্যটা বীভৎস।'

সূর্য ওঠার বিশ মিনিট আগে ঘুম ভাঙল রানার। স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে হাত বাড়াল বুট জোড়ার দিকে। মাঝখানে ক্যাম্পফায়ার, চারধারে শুয়ে রয়েছে লোকজন। নদীর পাড়, যেখান থেকে সিংহের গর্জন ভেসে আসে, এখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে।

ঘুমন্ত লোকগুলো আগুনের চারধারে একটা বৃত্ত তৈরি করেছে, তাদেরকে টপকে বেরিয়ে এল রানা। ঘাসের ডগায় মুক্তো দানার মত শিশির, ওর ট্রাউজারের নিচের দিকটা ভিজিয়ে দিল। পাহাড়-প্রাচীরের শেষ প্রান্তে উঁচু একটা পাথরের দিকে এগোল ও। ওটার ওপর বসে পুব দিকে তাকাল।

নদীর ওপর মেঘগুলোকে রাঙিয়ে তুলল নতুন দিনের প্রথম রোদ। জাম্বেজি নদী কুয়াশায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়ল একটা সিংহ, পরমুহূর্তে ধস্তাধস্তির আওয়াজ হলো, ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে এল কাতর একটা গোঙানি। শব্দগুলো অদ্ভুত এক শিহরণ সৃষ্টি করল রানার শরীরে। আগেও অনেক বার শুনেছে, তবু প্রতিবার একই রকম প্রতিক্রিয়া হয় ওর। ঠিক এরকমটি দুনিয়ার আর কোথাও নেই। রানার কাছে এটাই হলো আফ্রিকার কণ্ঠস্বর।

পিছনে মৃদু শব্দ। ঘাড় ফেরাতে যাবে রানা, ওর কাঁধে হাত রাখল আলি শাহ। পাথরের ওপর উঠে এসে রানার পাশে বসল সে, একটা সিগারেট ধরাল। 'দশ মিনিট আগে ট্র্যাকাররা ক্যাম্পে ফিরে এসেছে,' রানাকে বলল সে। 'হাতির একটা পাল দেখতে পেয়েছে ওরা।'

বন্ধুর দিকে তাকাল রানা। 'কটা?'

'প্রায় পঞ্চাশটা।' আদর্শ সংখ্যা। আরও বেশি হলে প্রসেস করতে পারবে না ওরা, কারণ প্রচণ্ড গরমে মাংস ও নাড়িভুঁড়িতে দ্রুত পচন ধরে। সংখ্যাটা আরও কম হলে খাজনার চেয়ে বাজনা হয়ে যেত বেশি। প্রচুর লোকবল ও মূল্যবান ইকুইপমেন্ট নিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। 'ঠিক জানো, উচিত হবে, এরকম একটা ব্যাপার ক্যামেরায় বন্দী করা?'

'ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া বা গোপন করা রীতিমত অন্যায় হবে।'

'লোকে মাংস খায়, চামড়া ব্যবহার করে, কিন্তু কসাইখানার ভেতরে কি ঘটছে জানতে চায় না,' যুক্তি দেখাল আলি শাহ।

'তবু মানুষের জানার অধিকার আছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আলি শাহ। 'অন্য কেউ হলে সন্দেহ করতাম, সাংবাদিক হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করছ। কিন্তু আমি জানি, কালিং অপারেশনকে আমার মতই ঘৃণা করো তুমি–যদিও এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তুমিই প্রথম আমাকে সচেতন করেছিলে।'

'চলো কাজ শুরু করি,' বলে পাথরটা থেকে নেমে পড়ল রানা, পার্ক করা ট্রাকগুলোর কাছে চলে এল দু'জন। ক্যাম্প জেগে উঠেছে, খোলা আগুনে পানি ফুটছে কফির। রেঞ্জাররা কেউ বিছানা গুটাচ্ছে, কেউ রাইফেল চেক করছে। মোট চারজন ওরা, দু'জন কালো, দু'জন সাদা। সবার পরনে পার্কস ডিপার্টমেন্টের খাকি ইউনিফর্ম, কাঁধে সবুজ ব্যাজ। পল নিউম্যান এরইমধ্যে ছবি তুলতে শুরু করেছে। তাকে দেখে রানার মনে হলো, সনি ক্যামেরাটা যেন তার শরীরেরই একটা অংশ।

'দর্শকদের স্বার্থে বোকা বোকা প্রশ্ন করব আমি,' আলি শাহকে সাবধান করে দিল রানা। 'ঠিক আছে?'

'গো অ্যাহেড।'

ধোঁয়াটে ক্যাম্প ফায়ারের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াল ওরা। ওদের দিকে ক্যামেরা তাক করল পল।

'এইমাত্র সূর্য উঠল, আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি জাম্বেজি নদীর কাছাকাছি। এখান থেকে বেশি দূরে নয়, আপনার ট্র্যাকাররা হাতির একটা পাল দেখতে পেয়েছে। এর আগে আপনি ব্যাখ্যা করেছেন, চিউইউই পার্কে কেন আপনারা এই বিশাল আকৃতির এত বেশি পশু রাখতে পারবেন না। বলেছেন, শুধু এই বছরই অন্তত এক হাজার হাতিকে সরিয়ে ফেলতে হবে। শুধু যে ইকোলজির স্বার্থে তা নয়, অবশিষ্ট হাতির পালগুলোর অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেও। এখন বলুন, কিভাবে ওগুলোকে আপনি সরাতে চান?'

'সরাতে চাই কালিং অপারেশনের মাধ্যমে,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল আলি শাহ।

'কালিং অপারেশন?' জানতে চাইল রানা। 'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, ওগুলোকে আপনারা মেরে ফেলবেন?'

'হ্যাঁ। আমি ও আমার রেঞ্জাররা ওগুলোকে গুলি করব।'

'সব ক'টাকে, ওয়ার্ডেন? আজ আপনি পঞ্চাশটা হাতিকে মারবেন?'

'আমরা গোটা পালটাকে সরিয়ে দেব।'

'বাছুর আর গর্ভবতী? ওদেরকেও?'

'সবগুলোকে যেতে হবে।'

'কিন্তু কেন, ওয়ার্ডেন? ইচ্ছে করলে আপনি ওদেরকে ধরে অন্য কোথাও পাঠাতে পারেন না?'

ঠোঁটে তিক্ত হাসির ক্ষীণ আভাস, জবাব দিল আলি শাহ। হাতি পরিবহন অত্যন্ত খরচবহুল একটা ব্যাপার। বড় একটা মদ্দার ওজন ছয় টন, গাভীগুলোর গড়পড়তা ওজন চার। চারদিকে পাহাড় আর খাদ, হাতিগুলোকে অন্য কোথাও পাঠাতে হলে বিশেষ ধরনের ট্রাক ও রাস্তা দরকার, দুটোর কোনটাই পাওয়া সম্ভব নয়। আর যদি পাঠানো সম্ভব হতও, কোথায় পাঠাবে তারা? জিম্বাবুইয়ে অতিরিক্ত হাতি বিশ হাজার। কে জায়গা দেবে এত হাতিকে?

'তারমানে এত সুন্দর একটা প্রাকৃতিক সম্পদ স্রেফ অপচয় হবে?'

প্রতিবাদ করল আলি শাহ। অপচয় হবে কেন? হাতির পালটাকে মারার পর যে আইভরি, মাংস আর নাড়িভুঁড়ি পাওয়া যাবে তা বিক্রি করবে তারা। ওই টাকা ব্যবহার করা হবে পার্ক রক্ষা ও পোচারদের প্রতিরোধ করার কাজে।

'কিন্তু ওয়ার্ডেন, বাছুর আর মায়েদের কেন মারবেন আপনি?'

'মারব, তার কারণও আছে। হাতির পালগুলো পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, পারিবারিক আত্মীয়স্বজনদের মত। কুকুর, ডলফিন বা বিড়ালের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান হাতি। পালের একটা হাতি যদি বেঁচে যায়, সে তার আতঙ্ক অন্যান্য পালগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দেবে। হাতিদের সামাজিক আচরণে দেখা দেবে চরম বিশৃঙ্খলা।'

'ব্যাখ্যা করবেন, প্লীজ?'

'অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কথাটা। যুদ্ধের সময় গাভীগুলোকে রেখে মারা হলো শুধু বাছুর আর বয়স্ক পুরুষগুলোকে। এক এক মরসুমে এক এক এলাকায় থাকে হাতির পাল, নির্দিষ্ট একটা প্যাটার্ন আছে এলাকা বদল করার-- সেটা ভেঙে গেল। এমন কি সন্তান ধারণের অভ্যেসেও অসঙ্গতি দেখা দিল। পরিণত পুরুষরা যেন টের পেয়ে গেল তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে, নাবালিকা হস্তিনীর ওপর চড়াও হলো তারা। ওরা যে বাচ্চা প্রসব করল সেগুলো হলো বামন ও পঙ্গু।' মাথা নাড়ল আলি শাহ। 'না, পালের সব ক'টা হাতিকেই মারতে হবে।' হঠাৎ আকাশের দিকে তাকাল সে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'স্পটার প্লেন এসে গেছে।' হাত বাড়াল রেডিওর মাইক্রোফোনের দিকে।

*

বাছুর আর গাভী নিয়ে পালে রয়েছে মোট বাহান্নটা হাতি। স্পটার প্লেন পালটাকে খেদিয়ে নদীর পাশে সমতল জমিনে নিয়ে এল। এখানে, ঘাসবনে, শুরু হলো নিধন পর্ব। গোটা ব্যাপারটা শুধু নিষ্ঠুর নয়, অমানবিক ও বীভৎসও বটে, তবে হাতিকুলের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে এর কোন বিকল্পও নেই। রানার ক্যামেরাম্যান পল নিউম্যান গোটা শিকার পর্বের ছবি তো তুললই, চীফ ওয়ার্ডের আলি শাহের অকাট্য যুক্তিও রেকর্ড করে নিল।

পরদিন সকালে বিষণ্ন মন নিয়ে সূর্যোদয় দেখছে রানা। চিউইউই ন্যাশনাল পার্কে আজই ওর শেষ দিন। অনেক দিন পর আলি শাহের সঙ্গে দেখা হবার পর পুরানো বন্ধুত্ব ও ভালবাসা নতুন করে আবিষ্কার করেছে ও, মনটা খারাপ হয়ে আছে আবার কত বছর পর দেখা হবে ভেবে। বছর কয়েক আগে ম্যানুয়েল রিভেরা ও তাঁর মেয়ে মনিকাকে নিয়ে 'অসুর'-কে শিকার করার সময় জিম্বাবুই গেম ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ডিরেক্টর পিটার ফাঙ্গাবেরার সঙ্গে রানার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়, বাতিল করা হয় ওর কনসেশন লাইসেন্স। শুধু তাই নয়, শাঙ্গানি সর্দার জেনারেল কিরিকিটি বাওনা রানাকে জিম্বাবুই থেকে স্টিংগার মিসাইল লুঠ করে আনতে বাধ্য করেছিল, ফলে জিম্বাবুই সরকার রানাকে অপরাধী ও শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে। সে-সময় মনে হয়েছিল ভবিষ্যতে আর কখনও জিম্বাবুইয়ের মাটিতে পা ফেলতে পারবে না রানা। পরে, কিরিকিটি বাওনা নিহত হবার পর, দূতাবাসের মাধ্যমে দেয়া বাংলাদেশ সরকারের ব্যাখ্যা মেনে নেয় জিম্বাবুই সরকার, রানার বিরুদ্ধে ঘোষণাটা প্রত্যাহার করে নেয়। দুর্নীতির অভিযোগে পিটার ফাঙ্গাবেরার চাকরি যাবার পর ওর কনসেশন লাইসেন্সও ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন ইচ্ছে করলেই চিউইউই পার্কে শিকার করতে পারবে রানা, যদিও আবার কবে সময় ও সুযোগ পাবে বলা মুশকিল।

আজ শেষ দিন রানাকে দাওয়াত দিয়েছে আলি শাহ। ওর জন্যে জাল দিয়ে ঘেরা বাংলোর বারান্দায় অপেক্ষা করছিল সে। বারান্দার নিচে একবার থামল রানা, বাগানের চারদিকে চোখ বুলাল। এই বাংলো ও বাগান তৈরি করা হয় রানা যে-বছর প্রথম কনসেশন লাইসেন্স পায়, ইঁটের গাঁথুনি দেয়ার ও ফুলের চারা লাগাবার সময় রাজমিস্ত্রি ও মালীদের সঙ্গে ওর ঘামও ঝরেছে এখানে। আজ সেই বাংলো ও বাগান দেখাশোনা করছে আলি শাহ আর তার বউ রুমানা।

ভুট্টার তৈরি পরিজ, দুধের সর, পাখির সেদ্ধ ডিম, হাতে বেলা আটার রুটি, বাচ্চা মুরগির সুপ খাওয়াল রুমানা। নাস্তা শেষ করে রানাকে নিয়ে আইভরি গোডাউনের দিকে রওনা হলো আলি শাহ। পাহাড় বেয়ে নামার সময় একবার থামল রানা, চোখের ওপর হাত তুলে রোদ ঠেকাল, তাকাল অতিথিশালার দিকে। নদীর কিনারায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে খানিকটা জায়গা, পাশাপাশি খড় দিয়ে ছাওয়া কয়েকটা ঘর। খড় দিয়ে মোড়া হয়েছে আসলে সুন্দর দেখানোর জন্যে, ভেতরে পাথরের তৈরি দেয়াল ও ছাদ। ঘরগুলোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা বুনো ডুমুর গাছ। 'আলি, তুমি না আমাকে বললে ভিজিটরদের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে পার্ক?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'একটা ঘরে তো মনে হচ্ছে লোক

আছে, ঘরটার সামনে একটা গাড়িও দেখতে পাচ্ছি।'

'উনি আমাদের বিশেষ অতিথি, একজন ডিপ্লোম্যাট-হারারে-তে তাইওয়ানিজ রিপাবলিক অভ চায়নার অ্যামব্যাসাডর,' ব্যাখ্যা করল আলি শাহ। 'ভদ্রলোক ওয়াইল্ড লাইফ সম্পর্কে সাংঘাতিক ইন্টারেস্টেড, বিশেষ করে হাতি সম্পর্কে। এ-দেশে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্যে যে আন্দোলন চলছে, তাতে তাঁর প্রচুর অনুদান আছে। সেজন্যেই তাকে আমরা বিশেষ সুযোগ দিচ্ছি। ট্যুরিস্টদের সঙ্গে নয়, একা আসতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁর জন্যে আমি অতিথিশালা খুলে দিয়েছি...,' হঠাৎ থামল আলি শাহ, পরমুহূর্তে প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'ওই তো অ্যামব্যাসাডর সাহেব!'

পাহাড়ের গোড়ায় তিনজনের একটা দল দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখনও এতটা দূরে যে চেহারাগুলো কেমন বোঝা যাচ্ছে না। আবার ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করে রানা জানতে চাইল, 'কালিং অপারেশনে কাল যে দু'জন সাদা রেঞ্জার সাহায্য করল, তারা কোথায়?'

'ওদেরকে ওয়াঙ্কি ন্যাশনাল পার্ক থেকে ধার করা হয়েছিল। আজ খুব ভোরে বাড়ি ফিরে গেছে।'

দলটার কাছাকাছি চলে এল ওরা, তাইওয়ানিজ অ্যামব্যাসাডরকে আলাদাভাবে চিনতে পারল রানা। এত বড় একটা পদের তুলনায় বয়স কম ভদ্রলোকের। চীনাদের বয়স আন্দাজ করা অত্যন্ত কঠিন হলেও, রানা ধারণা করল কমবেশি চল্লিশ হবে। ভদ্রলোক বেশ লম্বা, একহারা গড়ন। সোজা, কালো চুল। সচরাচর মেধাবি লোকদের যেমন দেখা যায়, লম্বাটে নারকেল আকৃতির মাথা। ভদ্রলোক সুদর্শন, কলঙ্কহীন চামড়া। চেহারার মধ্যে কি যেন একটা আছে, সন্দেহ হয় শরীরে নির্ভেজাল চীনা রক্ত বইছে না, ইউরোপিয়ান রক্তের মিশেল আছে। তবে চোখ দুটো ঘন কালো, প্রায় গোলই বলা যায়। চোখের ওপরের পাতার কোণে, ভেতর দিকে যে ভাঁজটা চীনা বৈশিষ্ট্য জাহির করে, সেটা অনুপস্থিত।

'গুড মর্নিং, ইওর এক্সেলেন্সী,' বলল আলি শাহ, শ্রদ্ধা ও বিনয়ে সামান্য মাথা নোয়াল সে। 'আশা করি উপভোগ করছেন পরিবেশটা। আপনার জন্যে যথেষ্ট গরম তো?'

'গুড মর্নিং, ওয়ার্ডেন।' কালো দু'জন রেঞ্জারকে পিছনে রেখে ওদের দিকে এগিয়ে এলেন অ্যামব্যাসাডর। 'আমি আসলে ঠাণ্ডা ভালবাসি।' বুক খোলা হাফহাতা শার্ট পরে আছেন, কোমরে স্ল্যাকস। আসলেও মার্জিত ও শীতল লাগছে দেখতে।

'মে আই প্রেজেন্ট মি. মাসুদ রানা?' জিজ্ঞেস করল আলি শাহ। 'রানা, হিজ এক্সেলেন্সী দা অ্যামব্যাসাডর অভ তাইওয়ান, চঙমঙ গঙ।'

'পরিচয় দেয়ার কোন দরকার নেই, মি. রানা একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।' রানার হাতটা ধরার সময় ঠোঁট টিপে সুন্দর হাসি উপহার দিলেন চঙমঙ গঙ। 'আপনার টিভি প্রোগ্রামগুলো আমাকে মুগ্ধ করেছে, মি. রানা।' ভদ্রলোকের ইংরেজি দারুণ, যেন তাঁর মাতৃভাষা। 'বিশ্বাস করুন, আমি আপনার একজন ফ্যান।'

'আলি আমাকে বলছিল, অফ্রিকান ইকোলজি সম্পর্কে আপনি উদ্বিগ্ন। এ-দেশের বন্য প্রাণী সংরক্ষণে আপনার অবদানেরও প্রশংসা করছিল ও।'

মাথা নেড়ে ওয়ার্ডেনের প্রশংসা প্রত্যাখ্যান করলেন অ্যামব্যাসাডর। 'তেমন কিছুই আমি করতে পারিনি।' রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, দেখে মনে হলো চিন্তিত। 'মাফ করবেন, মি. রানা, আমি কিন্তু বছরের এ-সময়টায় চিউইউইতে অন্যকোন ভিজিটর আশা করিনি। আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলা হয়েছিল, পার্ক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

বলার সুরটা নরম ও মার্জিত হলেও, রানা বুঝতে পারল কোন কারণ ছাড়া প্রশ্নটা করা হয়নি। 'চিন্তা করবেন না, মি. গড। ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে আজ বিকেলেই আমি চলে যাচ্ছি। গোটা চিউইউই আপনার একার দখলে থাকবে।'

'ওহ্, প্লীজ, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি এতটা স্বার্থপর নই যে আপনাকে চলে যেতে বলব। সত্যি কথা বলতে কি, এত তাড়াতাড়ি আপনি চলে যাচ্ছেন শুনে দুঃখই লাগছে আমার। এমন অনেক বিষয় আছে, আপনার সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেলে কৃতজ্ঞ বোধ করতাম।' মুখে যা-ই বলুন, রানা অনুভব করল ও চলে যাবে শুনে স্বস্তিবোধ করছেন ভদ্রলোক। তাঁর চেহারায় এখনও যথেষ্ট পরিমাণে আন্তরিকতা রয়েছে, আচরণে রয়েছে বন্ধুত্বের ভাব, তারপরও এসব বহিরাবরণের নিচে বিভিন্ন স্তর ও গভীরতা আঁচ করতে পারছে রানা।

আইভরি ওয়্যারহাউসের দিকে হাঁটছে ওরা, ওদের মাঝখানে জায়গা করে নিলেন অ্যামব্যাসাডর। খোশ মেজাজে গল্প করছেন, আচরণে শিথিল ভাব। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে রেঞ্জার ও পোর্টারদের পথ ছেড়ে দিলেন, ওয়্যারহাউসের সামনে দাঁড়ানো ট্রাক থেকে গতকাল সংগ্রহ করা আইভরি নামাচ্ছে তারা। সনি ক্যামেরা নিয়ে আগেই হাজির হয়েছে পল নিউম্যান, প্রতিটি কোণ থেকে কাজটার ছবি তুলছে সে।

এখনও জমাট বাঁধা রক্ত লেগে রয়েছে প্রতিটি আইভরিতে। ট্রাক থেকে একটা করে নামিয়ে মান্ধাতা আমলের সমতল স্কেল-এ ওজন করা হলো। নড়বড়ে একটা টেবিলে বসে মোটা একটা লেজারে ওজন লিখে রাখল আলি শাহ। প্রতিটি দাঁতের জন্যে একটা করে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বরাদ্দ করল সে, এক সেট ইস্পাতের ডাইস দিয়ে নাম্বারটা দাঁতের গায়ে বসিয়ে দিল তার একজন রেঞ্জার। দাঁতটা এখন আইনগত বৈধতা পেলো, এটাকে নিলামে তোলা যাবে বা রফতানি করা যাবে বিদেশে।

কাজটা গভীর আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করছেন অ্যামব্যাসাডর চঙমঙ গড। একজোড়া আইভরি, ভারি বা বিরাট না হলেও, দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। দুর্লভ বৈশিষ্ট্য হলো, দুটো দাঁত হুবহু একইরকম দেখতে—দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, রঙে ও বাঁকগুলোয়।

স্কেলে তোলা হলো ওগুলো, সামনে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়লেন অ্যামব্যাসাডর। ওগুলোর গায়ে হাত বুলালেন তিনি। তাঁর ভঙ্গিটা অদ্ভুত লাগল রানার, যেন কোন প্রেমিক তার প্রেমিকার গায়ে হাত বুলাচ্ছে। 'নিখুঁত,' আটকে

রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। 'পারফেক্ট। আ ন্যাচারাল ওঅর্ক অভ আর্ট…।' রানা তাঁকে লক্ষ করছে বুঝতে পেরে থেমে গেলেন তিনি।

কেন যেন রানার মনে হলো গোটা আচরণটার মধ্যে অশ্লীল কি যেন আছে।

পিছিয়ে এসে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন অ্যামব্যাসাডর, ব্যাখ্যা দিলেন, 'হাতির দাঁতের জাদুকরী প্রভাব আছে আমার ওপর। আপনি হয়তো জানেন, আমরা চীনারা আইভরিকে [illegible] পবিত্র মঙ্গলচিহ্ন হিসেবে জ্ঞান করি। হাতির দাঁত নেই, এমন চীনা পরিবার খুব কমই আছে। হাতির দাঁত মঙ্গল ও সৌভাগ্য বয়ে আনে।'

'তাই!' রানার ঠোঁটে ভদ্রতাসূচক মৃদু হাসি।

'বলতে পারেন কুসংস্কার, তবে এতে আমরা বিশ্বাসী। অবশ্য গজদন্তের ওপর আমার পরিবারের বিশেষ আগ্রহের অন্য একটা কারণ আছে। আমার বাবা তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন আইভরি-কার্ভার হিসেবে। তিনি একজন প্রতিভাবান শিল্পী–ভাস্কর। এই শিল্পে তিনি এতই দক্ষ ছিলেন যে আমার জন্মের সময় খদ্দেরদের চাহিদা মেটানোর জন্যে তাইপে, ব্যাংকক, টোকিও ও হংকঙে দোকান খুলতে হয় তাঁকে–সে-সব দোকানে শুধু গজদন্তের তৈরি শিল্পকর্মই বিক্রি হত। আমার ছোটবেলার স্মরণীয় অভিজ্ঞতার বেশিরভাগই আইভরি দর্শন ও স্পর্শকে ঘিরে। আমাদের তাইপের দোকানে নবিস আইভরি-কার্ভার হিসেবে কাজ শুরু করি আমি, বাবার মতই আইভরিকে বুঝতে ও ভালবাসতে শিখেছি। বিশাল কালেকশন বাবার, মহামূল্যবান বললেও কিছু বলা হয় না…,' হঠাৎ থামলেন তিনি, তারপর ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হাসলেন। 'মাফ করবেন, প্লীজ। আসলে এ-প্রসঙ্গে নিজেকে আমি ধরে রাখতে পারি না–তবে ওই জোড়াটা সত্যি ভারি সুন্দর। জোড়ার দুটো দাঁত একই রকম, এটা সাধারণত দেখা যায় না–সত্যি দুষ্প্রাপ্য। বাবা দেখলে তো পাগল হয়ে যেতেন।'

চোখে শুধু আগ্রহ নয়, নগ্ন লোভ ফুটে উঠল, দাঁত দুটোর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক। ওজন করার পর ওয়্যারহাউসে নিয়ে গিয়ে আরও কয়েকশো আইভরির সঙ্গে রেখে দেয়া হলো ওগুলো।

'অদ্ভুত এক চরিত্র,' মন্তব্য করল রানা, প্রতিটি গজদন্ত ওয়্যারহাউসে রেখে তালা দেয়ার পর পাহাড় বেয়ে বাংলোয় ফিরছে আলি শাহের সঙ্গে, লাঞ্চ খাবে। 'কিন্তু কারিগরের ছেলে অ্যামব্যাসাডর হলো কিভাবে?'

জিভ ও টাকরা সহযোগে টট্-টট্ শব্দ করল আলি শাহ। 'মি. চণ্ডমণ্ড গণ্ডের বাবা কারিগর হিসেবে জীবন শুরু করলেও, সেখানে থেমে থাকেননি। যতটুকু জানি, আইভরির দোকানগুলো এখনও আছে বটে, তবে ও-সব এখন স্রেফ তাঁর হবি। তিনি এখন তাইওয়ানের অন্যতম ধনীদের একজন। চাইনীজ ধনী বলতে কি বোঝায় তুমি জানো। শুনতে পাই, প্যাসিফিক রিম-এর চারদিকের দেশগুলো থেকে মাখন তুলে নিচ্ছেন ওঁরা, মাখন তুলছেন আফ্রিকা থেকেও। বিরাট একটা পরিবার, ছেলেও অনেকগুলো, তাদের মধ্যে চণ্ডমণ্ড গণ্ড সবার ছোট–সবার চেয়ে নাকি বুদ্ধিমানও। তাঁকে আমার ভালই লাগে। তোমার কেমন লাগল?'

'হ্যাঁ, যথেষ্ট মার্জিত এবং ভদ্র, তবে আচরণে বিদঘুটে কি যেন একটা আছে। আইভরিতে হাত বুলানোর সময় মুখটা লক্ষ করেছ? মনে হলো...,' সঠিক শব্দ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলো রানা, 'আন্ন্যাচারাল।'

'নতুন হলে কি হবে, লেখকদের বৈশিষ্ট্য এরই মধ্যে এসে গেছে তোমার মধ্যে।' কৃত্রিম হতাশা ও বিস্ময়ে মাথা নাড়ল আলি শাহ। 'রোমাঞ্চকর কিছু খুঁজে না পেলে, নিজেরাই বানিয়ে নাও।' দু'জনেই ওরা হেসে উঠল।

চণ্ডমণ্ড গণ্ড কালো একজন রেঞ্জারকে পাশে নিয়ে পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, দেখলেন মাসাসা গাছগুলোর আড়ালে হারিয়ে গেল রানা ও আলি শাহ।

'টিভি সাংবাদিকের উপস্থিতি আমার ভাল ঠেকছে না,' বলল জামবু। আলি শাহের অধীনে চিউইউই পার্কের সিনিয়র রেঞ্জার সে। 'অপারেশনটা পিছিয়ে দিলে ভাল হয়। পরে কোন এক সময়...।'

'টিভি সাংবাদিক আজ বিকেলে চলে যাচ্ছে,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'তাছাড়া, কাজটা করার জন্যে প্রচুর টাকা নিয়েছ তোমরা। যে প্ল্যান করা হয়েছে তা এখন আর বদলানো সম্ভব নয়। বাকি সবাই এরইমধ্যে এখানে আসার জন্যে রওনা হয়ে গেছে, তাদেরকে ফেরত পাঠানো যাবে না।'

'আমাদেরকে যা দেয়ার কথা তার মাত্র অর্ধেক দিয়েছেন আপনি,' প্রতিবাদ করল জামবু।

'বাকি অর্ধেক পাবে কাজ শেষ করার পর, তার আগে নয়,' নরম সুরে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, লক্ষ করলেন জামবুর চোখ দুটো সাপের মত স্থির হয়ে আছে। 'পাওনা তো পাবেই, পুরস্কারও পাবে। কাজটা করতে রাজি হয়েছ তুমি, তাই না?'

চুপ করে থাকল জামবু। বিদেশী ভদ্রলোক এক হাজার ডলার দিয়েছেন তাকে। এক হাজার ডলার মানে তার ছ'মাস বেতনের সমান টাকা। কাজটা শেষ হলে আরও এক হাজার ডলার দেবেন।

'কি, কাজটা তুমি করবে তো?'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো জামবু। 'করব।'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যামব্যাসাডর। 'কাজটা আজ রাতে বা কাল রাতে হতে হবে, তার পরে নয়। দু'জনেই তোমরা তৈরি থাকো।'

'আমরা তৈরি হয়েই আছি,' আশ্বাস দিয়ে ল্যাণ্ডরোভারে উঠল জামবু। দ্বিতীয় রেঞ্জার আগেই গাড়িতে উঠে বসে আছে। চলে গেল তারা।

জনশূন্য অতিথিশালায়, নিজের কটেজে ফিরে এলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। ত্রিশটা কটেজ, সবগুলো একই রকম দেখতে, সাধারণত শুকনো ও ঠাণ্ডা মরশুমে ট্যুরিস্টরা দখল করে নেয়। রিফ্রিজারেটর থেকে বরফ দেয়া হুইস্কি নিয়ে পর্দা ঘেরা পোর্চ-এ চলে এলেন অ্যামব্যাসাডর, আগুনে দুপুরটা পার করতে হবে।

নার্ভাস ও অস্থির বোধ করছেন তিনি। জামবুর আশঙ্কাটা তাঁর মনেও শিকড় গেড়েছে। সম্ভাব্য কি কি ঘটতে পারে মনে রেখে, প্রতিটির জন্যে আলাদা প্ল্যান তৈরি করা হলেও, অপ্রত্যাশিত কিছু একটা সবসময়ই ঘটে—

যেমন, মাসুদ রানার উপস্থিতি।

এত বড় মাপের কাজ এই প্রথম হাতে নিয়েছেন তিনি। এটাকে প্রায় একটা অভ্যুত্থানই বলা যায়। গোটা ব্যাপারটা তাঁর একার উদ্যোগে ঘটতে যাচ্ছে। পুরস্কারের তুলনায় ঝুঁকিটা বিরাট, কোন সন্দেহ নেই। তিনি যদি সফল হন, তাঁর বাবা তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন। আর্থিক লাভের চেয়ে এটার গুরুত্ব তাঁর কাছে অনেক বেশি। ভাইদের মধ্যে সবার ছোট তিনি, বাবার প্রিয়তম পুত্র হতে চাইলে কঠিন সাধনা করতে হবে তাঁকে। সেই সাধনারই একটা অংশ আজকের এই অপারেশন। কোনভাবেই তাঁর ব্যর্থ হওয়া চলবে না।

হারারে দূতাবাসে বেশ ক'বছর আছেন তিনি, অবৈধ আইভরি ও গণ্ডারের শিং পাচারে ভালই হাত পাকিয়েছেন। ব্যাপারটা শুরু হয় মাঝারি শ্রেণীর এক সরকারী কর্মকর্তার একটা মন্তব্যে। এক ডিনার পার্টিতে তিনি বলেন, বিদেশী কূটনীতিকরা নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধে পান, তবে সবাই তা পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেন না। কি ধরনের সুযোগ? জানতে চান চণ্ডমণ্ড গণ্ড। উত্তর আসে, এই যেমন ডিপ্লোম্যাটিক কুরিয়ার সার্ভিস। বাবার কাছ থেকে ব্যবসার ট্রেনিং পেয়েছেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেন তাঁকে একটা প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সরাসরি কিছু না বলে সরকারী কর্মকর্তাকে উৎসাহ দেন তিনি।

এরপর এক হপ্তা কেটে গেল জটিল ও মন্থরগতি আভাস ও ইঙ্গিত আদান-প্রদানে। তারপর সরকারের আরও উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তার সঙ্গে গলফ খেলার আমন্ত্রণ পেলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। তাঁর ড্রাইভার অ্যামব্যাসাডোরিয়াল মার্সিডিজ পার্ক করল হারারে গলফ ক্লাবের পিছন দিকে, তারপর নির্দেশ মত গাড়ি ছেড়ে চলে গেল। দশ মিনিট পর গাড়ি থেকে নেমে কোর্স-এ পা রাখলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। গলফার হিসেবে খুবই দক্ষ তিনি, তবে আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে ইচ্ছে করে হেরে গিয়ে ক্লাবের অন্যান্য সদস্যদের সামনে নগদ তিন হাজার মার্কিন ডলার খেসারত দিলেন। সরকারী বাড়িতে ফিরে এসে মার্সিডিজটা গ্যারেজে রেখে বিদায় নিতে বললেন ড্রাইভারকে। গাড়ির বুটে পেলেন বড় আকারের ছ'টা গণ্ডারের শিং, পাটের বস্তা দিয়ে মোড়া।

পরবর্তী ডিপ্লোম্যাটিক পাউচে ভরে ওগুলো তিনি তাইপে-তে পাঠিয়ে দিলেন, সেখানে দাম পাওয়া গেল ষাট হাজার মার্কিন ডলার। ছেলের এই ব্যবসা বুদ্ধি দেখে ভারি খুশি হলেন চণ্ডকিণ্ড গণ্ড, দীর্ঘ চিঠি লিখে আইভরির ওপর তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ও আগ্রহের কথা জানাতেও ভুললেন না।

চণ্ডমণ্ড গণ্ড কৌশলে ও সাবধানে বিশেষ একটা মহলে কথাটা ছড়িয়ে দিলেন, গণ্ডারের শিং ও হাতির দাঁত তাঁর খুবই প্রিয়, তাঁর ওপর এগুলোর জাদুকরী প্রভাব আছে। রেজিস্টারে ওঠেনি বা সীল মারা হয়নি, এরকম দাঁত ও শিং বিক্রি করার প্রস্তাব আসতে শুরু করল তাঁর কাছে। পোচারদের ছোট্ট, বদ্ধ একটা জগতে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা, মাঠে নতুন একজন ক্রেতার আবির্ভাব ঘটেছে।

মাস কয়েকের মধ্যে মালাবি-র একজন শিখ ব্যবসায়ী লাভজনক ব্যবসার প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো। মালাবি লেকে মাছ ধরার বিশাল এক প্রকল্পে তাইওয়ানিজ পুঁজি দরকার তার। ব্যবসার ধরন ও লাভের হারটা তাইপেতে চিঠি

লিখে বাবাকে জানালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, চণ্ডকিণ্ড গণ্ড চাখার সিং-এর সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চারে ব্যবসা করতে রাজি হলেন। দূতাবাসে বসে চুক্তিপত্রে সই করলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, সেই রাতেই তিনি চাখার সিংকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানালেন। ডিনারে বসে চাখার সিং বলল, 'আমি জানতে পেরেছি, আপনার মহান পিতা আইভরি খুব ভালবাসেন। আমার খুব ইচ্ছে, আপনার পরিবারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রমাণের জন্যে, নিয়মিত আইভরি সরবরাহের একটা ব্যবস্থা করি। আমি জানি, সরকারী বাধা নিষেধ এড়িয়ে ওগুলো আপনি নিরাপদেই আপনার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারবেন। ভাল কথা, আইভরিগুলো হবে সীল ছাড়া।'

অল্পদিনের মধ্যেই চণ্ডমণ্ড গণ্ডের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে আফ্রিকার যে-সব দেশে এখনও প্রচুর হাতি ও গণ্ডার আছে সে-সব দেশে একটা নেটওঅর্ক-এর মাধ্যমে অপারেশন চালাচ্ছে চাখার সিং। তার ব্যবসার পরিধি কল্পনাকেও হার মানায়। বতসোয়ানা, অ্যাঙ্গোলা, জাম্বিয়া, তাঞ্জানিয়া ও মোজাম্বিক থেকে সাদা সোনা ও শিং সংগ্রহ করছে সে। এ-সব দেশে তার নিজস্ব লোক আছে, সবাই তারা সশস্ত্র, প্রতিটি ন্যাশনাল পার্কে নিয়মিত হানা দেয়।

প্রথমদিকে চণ্ডমণ্ড গণ্ড ছিল তার আরেকজন খদ্দের মাত্র, তবে মাছ ধরার ব্যবসায় প্রচুর লাভ হওয়ার সূত্রে সম্পর্কটা দ্রুত বদলে গেল। ঘন ঘন দেখা হলো ওদের, বিশ্বাস ও আন্তরিকতা বাড়ল। অবশেষে চাখার সিং চণ্ডমণ্ড গণ্ড ও তাঁর বাবাকে আইভরি ব্যবসাতেও পার্টনার হবার প্রস্তাব দিল। ব্যবসাটা বড় করার জন্যে স্বভাবতই একটা বড় অঙ্কের পুঁজি দাবি করল সে, আরও বড় একটা অং দাবি করল তার দ্বারা অর্জিত ব্যবসার গুডউইল-এর মূল্য বাবদ। সব মিলিয়ে প্রায় তিন মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে বাবার পরামর্শ মত দরকষাকষি করে প্রাথমিক দেয় টাকার পরিমাণ অর্ধেক কমাতে পারলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

পার্টনার হবার পরই কেবল ব্যবসাটার রহস্য ও বিস্তৃতি সম্পর্কে জানতে পারলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। হাতির পাল আছে এমন প্রতিটি দেশের সরকারী মহলে নিজের লোক আছে চাখার সিং-এর, যারা তার কাছ থেকে নিয়মিত ঘুষ খায়। তার কনট্যাক্ট-এর মধ্যে অনেকেই মন্ত্রীসভার সদস্য। বড় আকারের প্রতিটি ন্যাশনাল পার্কে বেতনভুক ইনফর্মার আছে তার। তাদের কেউ সামান্য রেঞ্জার বা গেইম স্কাউট, আবার কেউ চীফ ওয়ার্ডেন।

ইতিমধ্যে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের বাবা ও ভাইরা আফ্রিকায় পুঁজি খাটানোর সুযোগ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। ব্যবসা আছে দেখলেই পুঁজি ঢালতে শুরু করল তারা, বৈধ বা অবৈধ কিনা বিবেচনা করল না। প্রথম তারা পুঁজি খাটাল দক্ষিণ আফ্রিকায়। সাদা-কালোয় যুদ্ধ হচ্ছে ওখানে, বিদেশী সাহায্যের ওপর রয়েছে নিষেধাজ্ঞা, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা এত খারাপ যে পানির দামে বিক্রি হচ্ছে জমি। তাইপেতে তিন কামরার একটা ফ্ল্যাটের যে দাম সেই একই দামে দক্ষিণ আফ্রিকায় দশ হাজার একর জমি কেনা যায়। শুধু যে জমি তা নয়, পানির দামে অফিস পাড়া কিনল তারা, কিনল শপিং সেন্টার আর কল-কারখানা—এক ডলারের জিনিস পাঁচ বা দশ সেন্টে।

চণ্ডমণ্ড গণ্ডের বাবা, এককালে যিনি হংকং রেসিং ক্লাবের স্টুয়ার্ডও ছিলেন,

একটা মাত্র ঘোড়ার ওপর সর্বস্ব বাজি ধরাটা পছন্দ করলেন না। আফ্রিকার অন্যান্য দেশেও পুঁজি খাটাল তারা। নামিবিয়া স্বাধীনতা পেতে যাচ্ছে, মাছ ধরার ও খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের এজেন্সি কিনে ফেলল। চাখার সিং-এর মাধ্যমে জাম্বিয়া, জায়ারে, কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়া সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে পরিচয় হলো চণ্ডমণ্ড গণ্ডের, নিজেদের দেশে তাঁরা তাইওয়ানিজ পুঁজি পেতে চান।

দিনে দিনে তাদের ব্যবসার সংখ্যা বাড়লেও ভাবাবেগজনিত কারণে হাতির দাঁতের ব্যবসার প্রতি চণ্ডমণ্ড গণ্ডের বাবার দুর্বলতা থেকেই গেল। বাবার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করার জন্যে প্রায়ই তাইপেতে আসেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। একবার তিনি ছেলেকে বললেন, 'বাপ আমার, একটা জিনিসের অভাব আমাকে খুব কষ্ট দেয়। রেজিস্টার করা ও সীল মারা আইভরি খুব বেশি নেই আমাদের। এবার আফ্রিকায় ফিরে দেখো দেখি বড় একটা চালান ম্যানেজ করতে পারো কিনা।'

'কিন্তু বাবা, বৈধ আইভরি শুধু সরকারী নিলাম থেকে কেনা যায়...,' বাবার চোখে তিরস্কার, দেখে মাঝপথে থেমে গেলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

'সরকারী নিলাম থেকে কেনা আইভরির ব্যবসায়ে লাভ খুব কম,' হিসহিস করে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'তোমার কাছ থেকে এরকম একটা জবাব আশা করিনি আমি।' বাবার তিরস্কার গভীর দাগ কাটল চণ্ডমণ্ড গণ্ডের মনে, এরপর প্রথম সুযোগেই চাখার সিং-এর সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলেন তিনি।

চাখার সিং চিন্তিতভাবে তার দাড়িতে হাত বুলাল। সুদর্শন পুরুষ সে, সাদা পাগড়িটা দারুণ মানিয়ে গেছে। 'এই মুহূর্তে সীল মারা আইভরির একটিমাত্র উৎসের কথা মনে পড়ছে আমার—সরকারী ওয়্যারহাউস।'

'আপনি বলতে চাইছেন, নিলামে তোলার আগে ওয়্যারহাউস থেকে আইভরি সরিয়ে ফেলা যায়?'

'হয়তো যায়...,' কাঁধ ঝাঁকাল চাখার সিং। 'তবে সেজন্যে দরকার হবে জটিল ও পরিশ্রমসাপেক্ষ প্ল্যান। উৎকট একটা সমস্যা, মাথা ঘামানোর জন্যে কিছুটা সময় দিন আমাকে।'

তিন হপ্তা পর আবার তারা বসল চাখার সিং-এর অফিসে। অফিসটা অভিজাত নাইরোবি এলাকায়। 'মাথা আমি প্রচুর ঘামিয়েছি, একটা সমাধানও ধরা দিয়েছে,' চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে জানাল চাখার সিং।

'কি রকম খরচ পড়বে?' প্রথম প্রশ্ন অ্যামব্যাসাডরের।

'সীল না মারা আইভরি প্রতি কিলো যে দামে কেনেন, সেই একই দামে পাবেন। এটাই প্রথম ও শেষ সুযোগ, পরে আর ব্যবস্থা করা যাবে না, কাজেই প্রথমবারই যত বেশি সম্ভব সরিয়ে ফেলতে হবে। পুরো এক গুদাম মাল, নেভার মাইণ্ড। আপনার বাবার প্রতিক্রিয়া কি হবে?'

খর্বকায় বাবা উল্লাসে তিনটে লাফ দেবেন, জানেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। সীল মারা আইভরি মানে বৈধ আইভরি, অবৈধ আইভরির চেয়ে তিন কি চার গুণ বেশি দামে বিক্রি হবে তাইওয়ানের বাজারে।

'আসুন বিবেচনা করে দেখি কোন দেশের গুদামে আমাদের লুঠ করার অপেক্ষায় আইভরি রাখা আছে', বলল চাখার সিং, তবে পরিষ্কারই বোঝা গেল যে

কোথায় হানা দিতে হবে জানে সে। 'জায়ারে নয়, নয় দক্ষিণ আফ্রিকা। এই দুটো দেশে আমার সংগঠন তেমন শক্তিশালী নয়। জাম্বিয়া, তাঞ্জানিয়া আর কেনিয়ায় খুব বেশি আইভরি নেই। বাকি থাকল বতসোয়ানা, যেখানে বড় ধরনের কালিং অপারেশন এখনও শুরু হয়নি, আর থাকল জিম্বাবুই।'

'গুড।' সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকালেন অ্যামব্যাসাডর।

'ওখানকার আইভরি গেম ডিপার্টমেন্টের ওয়্যারহাউসে জমা রাখা হয়—ওয়্যারহাউসগুলো আছে ওয়াঙ্কি, হারারে ও চিউইউইতে। তিনটের যে-কোন একটা ওয়্যারহাউস থেকে দাঁত সংগ্রহ করব আমরা।'

'আসলে কোনটা থেকে?'

'হারারের অয়্যারহাউসে কড়া পাহারা,' বলল চাখার সিং, খাড়া করা তিনটে আঙুল দেখাল চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে, একটা নামিয়ে নিল, অর্থাৎ হারারেকে বাতিল করল। 'ওয়াঙ্কি হলো সবচেয়ে বড় ন্যাশনাল পার্ক। কিন্তু অসুবিধে আছে, জাম্বিয়ান সীমান্ত থেকে অনেক দূরে জায়গাটা।' আরেকটা আঙুল ভাঁজ করল সে। 'বাকি থাকল চিউইউই। ওখানকার স্টাফদের মধ্যে বিশ্বস্ত লোক আছে আমার। তারা আমাকে জানিয়েছে, এই মুহূর্তে সীল মারা আইভরিতে প্রায় ভরাট হয়ে আছে ওয়্যারহাউস। পার্কের হেডকোয়ার্টার জাম্বেজি নদী ও জাম্বিয়ান সীমান্ত থেকে ত্রিশ মাইলেরও কম দূরে। আমার একটা দল নদী পেরিয়ে সারা দিন হাঁটলেই পৌঁছে যাবে ওখানে, নেভার মাইণ্ড।'

'আপনি ওয়্যারহাউসটা লুঠ করতে চান?' ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়লেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

'সন্দেহের লেশ মাত্র নেই,' আঙুলটা নামিয়ে বলল চাখার সিং, বিস্মিত দেখাল তাকে। 'আপনিও কি ঠিক তাই চাইছেন না, একেবারে প্রথম থেকে?'

'সম্ভবত,' সাবধানে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'কিন্তু ব্যাপারটা কি সম্ভব?'

'চিউইউই নির্জন ও দুর্গম একটা এলাকা, নদীর তীরে—নদীটা আবার আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসেবে রয়েছে। আমি বিশজনের একটা হানাদার বাহিনী পাঠাব, যাদের কাছে শুধু অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র থাকবে, নেতৃত্বে থাকবে আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও সেরা একজন শিকারী। অন্ধকারে ক্যানুতে চড়ে নদী পেরোবে তারা, সারাদিন হেঁটে পার্কের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে হানা দেবে। তারা কোন সাক্ষী রাখবে না...।'

আড়ষ্ট ও নার্ভাস হলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, খুক করে কাশলেন একবার। চোখে প্রশ্ন, তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে চাখার সিং। 'কোন সাক্ষী রাখবে না...মানে?'

'মানে মানকচু, ভাতে দিলে ভর্তা—সাক্ষীদের খেয়ে ফেলা হবে, যদিও আক্ষরিক অর্থে নয়।' হাসল চাখার সিং। 'ব্যবসা করতে হলে সেন্টিমেন্টাল হলে চলবে না। আরে ভাই, লোক বলতে ওখানে থাকবে চার কি পাঁচজন। পারমানেন্ট রেঞ্জাররা আমার টাকা খায়। বৃষ্টির মরশুমে অতিথিশালা বন্ধ থাকবে, কর্মচারীদের বেশিরভাগ ছুটি নিয়ে যে-যার গ্রামে চলে যাবে। থাকবে শুধু পার্ক ওয়ার্ডেন আর দু'একজন নগণ্য স্টাফ।'

'তবু, ওদেরকে না সরিয়ে কোন ব্যবস্থা করা যায় না?' কারণটা মানুষের প্রতি

ভালবাসা বা কোমল হৃদয় নয়, অনাবশ্যক ঝুঁকি না নেয়ার প্রবণতা। ইতস্তত করছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

'আপনি যদি কোন বিকল্প দেখাতে পারেন, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি আছি আমি,' বলল চাখার সিং।

কয়েক মুহূর্ত পর এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন অ্যামব্যাসাডর। 'না, এই মুহূর্তে কোন বিকল্প পাচ্ছি না। আপনার প্ল্যানের বাকি অংশটুকু শোনান, প্লীজ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, নেভার মাইণ্ড। আমার লোকেরা সব সাক্ষীকে সরিয়ে দেবে, আগুন লাগাবে ওয়্যারহাউসে, তারপর নদী ধরে ফেরত যাবে।' থামল শিখ পার্টনার, চেহারায় চেপে রাখতে না পারা উল্লাস, চণ্ডমণ্ড গণ্ডের পরবর্তী প্রশ্ন শোনার আগ্রহে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। ব্যাপারটা প্রশ্ন করে জেনে নিতে হচ্ছে বলে অস্বস্তিবোধ করলেন অ্যামব্যাসাডর। প্রশ্নটা তার নিজের কানেই বোকার মত লাগল।

'কিন্তু আইভরি?'

খ্যাক খ্যাক করে হাসল চাখার সিং, পান খাওয়া খয়েরি দাঁত ও মাড়ি বেরিয়ে পড়ল, প্রশ্নটা আরেকবার উচ্চারণ করতে বাধ্য করল চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে।

'আপনার পোচাররা কি আইভরি নিয়ে যাবে? আপনি বললেন ছোট একটা দল। অত আইভরি তারা বয়ে নিয়ে যাবে কিভাবে?'

'আমার প্ল্যানের বৈশিষ্ট্যই এখানে। জিম্বাবুই পুলিস কেসটার কোন সমাধানই করতে পারবে না।' চাখার সিং-এর কথায় এবার একটু হাসি ফুটল অ্যামব্যাসাডরের ঠোঁটে। 'আমরা চাই পুলিস বিশ্বাস করুক পোচাররা সমস্ত আইভরি নিয়ে চলে গেছে। তাহলে তারা দেশের ভেতর ওগুলো খুঁজবে না, খুঁজবে কি?'

এই মুহূর্তে, আগুনে দুপুরটা বারান্দায় বসে পার করার সময়, চোয়াল শক্ত করলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। চাখার সিং-এর প্ল্যানটা সত্যি দারুণ, তবে প্ল্যানটা করার সময় মাসুদ রানা ও তাঁর টিভি ক্রুদের উপস্থিতির কথা ভাবা হয়নি।

অপারেশনটা বাদ দেয়া যায় কিনা আরেকবার চিন্তা করলেন তিনি, প্রায় সাথে সাথে বাতিল করে দিলেন ধারণাটা। ইতিমধ্যে চাখার সিং-এর লোকজন নদী পেরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে ক্যাম্পের দিকে। তাদের কাছে বার্তা পাঠানোর কোন উপায় নেই তাঁর, কাজেই ফেরত যেতে বলা সম্ভব নয়। বিকেলেই যদি মাসুদ রানা ও তাঁর ক্রুরা চলে যান, সব দিক থেকে ভাল হবে সেটা। ওঁরাও প্রাণে বাঁচবেন, হানাদার বাহিনীরও ঝামেলা কমবে। কিন্তু যদি উল্টোটা ঘটে, হানাদার বাহিনী এখানে পৌঁছে যদি দেখে যে টিভি ক্রুদের নিয়ে মাসুদ রানা ক্যাম্পে রয়েছেন, তাহলে চীফ ওয়ার্ডেন, তার পরিবার, ও স্টাফদের সঙ্গে ওদেরকেও সরিয়ে দিতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

চিন্তায় বাধা পড়ল, বারান্দার শেষ মাথায় টেলিফোন বাজছে। অতিথিশালায় শুধু ভিআইপি কটেজে টেলিফোন আছে। লাফ দিয়ে উঠে দ্রুত পায়ে এগোলেন এমব্যাসাডর। ফোনটার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। এটাও অপারেশন প্ল্যানের একটা অংশ, অনেক ভেবেচিন্তে আয়োজন করা হয়েছে।

'অ্যামব্যাসাডর গণ্ড,' রিসিভার তুলে বললেন তিনি।

আলি শাহ বলল, 'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, ইওর এক্সেলেন্সী। আপনার হারারে এমব্যাসী থেকে একটা কল এসেছে। এক ভদ্রলোক, নাম বলছেন মি. চাঙ। বলছেন, তিনি আপনার সেক্রেটারি। কলটা আপনি ধরবেন কি?'

'ধন্যবাদ, ওয়ার্ডেন। হ্যাঁ, মি. চাঙের সঙ্গে কথা বলব আমি।' জেলার টেলিফোন এক্সচেঞ্জটা দেড়শো মাইল দূরে ছোট্ট এক গ্রামে, লাইনটা এসেছে গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দুর্গম পাহাড়গুলোকে পাশ কাটিয়ে, হারারে থেকে রিলে করা তাঁর সেক্রেটারির কণ্ঠস্বর এত অস্পষ্ট লাগল যেন সৌরজগতের শেষ প্রান্ত থেকে কথা বলছে সে। মেসেজটা ঠিক যেমন আশা করেছিলেন তিনি। হাতলটা ধরে ঝাঁকাতে লাইনে আবার আলি শাহ ফিরে এল। অ্যামব্যাসাডর বললেন, 'ওয়ার্ডেন, হঠাৎ একটা জরুরী অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় এখুনি আমাকে হারারেতে ফিরে যেতে হবে। খুবই হতাশ বোধ করছি, ভেবেছিলাম আরও ক'টা দিন বিশ্রাম নেব এখানে। কিন্তু কপাল মন্দ...।'

'সেকি! কিন্তু আমি আর আমার স্ত্রী ভাবছিলাম কাল বা পরশু আপনাকে দাওয়াত দেব...।'

'লোভনীয় প্রস্তাব, কিন্তু নিজেকে বঞ্চিত না করে উপায় নেই আমার। কথা দিলাম, পরের বার যখন আসব, আপনার গিন্নীর হাতের রান্না না খেয়ে চিউইডউই থেকে যাব না।'

'আজ সন্ধ্যায় রিফ্রিজারেটর ট্রাক রওনা হচ্ছে হাতির মাংস নিয়ে, কারোই পর্যন্ত যাবে। ভাল হয় আপনি যদি কনভয়টার সঙ্গে যান। আকাশের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে অথচ আপনার মার্সিডিজ ফোর-হুইল ড্রাইভ নয়।'

এটাও ওদের প্ল্যানেরই একটা অংশবিশেষ। কালিং অপারেশন ও রিফ্রিজারেটর ট্রাক রওনা হবার দিন ও ক্ষণ মনে রেখে হানা দেয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে, জানতে চাওয়ার আগে ইচ্ছা করে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন অ্যামব্যাসাডর। 'ট্রাকগুলো ঠিক কখন রওনা হবে?'

'একটার এঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দিয়েছে।' রেঞ্জার জামবু অলটারনেটর নষ্ট করে রেখেছে। উদ্দেশ্য হলো, হানাদার বাহিনী না পৌঁছুনো পর্যন্ত কনভয়টাকে রওনা হতে দেরি করিয়ে দেয়া। 'তবে ড্রাইভার আমাকে জানিয়েছে, সন্ধে ছটার দিকে রওনা হতে পারবে তারা।' তারপর, হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায়, আলি শাহ তাড়াতাড়ি বলল, 'অবশ্য মি. মাসুদ রানা একটু পরই রওনা হয়ে যাচ্ছেন, আপনি তাঁর সঙ্গেও যেতে পারেন। দুর্গম রাস্তা, কত রকম বিপদ ঘটতে পারে...।'

'না। না!' দ্রুত বাধা দিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'এত তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ট্রাকগুলোর জন্যেই অপেক্ষা করব।'

'আপনি যা ভাল মনে করেন,' গলা শুনে মনে হলো বিস্মিত হয়েছে আলি শাহ। 'তবে ড্রাইভার যা-ই বলুক, কখন যে ট্রাকগুলো রওনা হতে পারবে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। আমি বললে মি. রানা এক-দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে রাজি হবেন।'

না।' দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন অ্যামব্যাসাডর। 'মি. রানাকে বিরক্ত করতে বা দেরি করিয়ে দিতে রাজি নই আমি। আপনার কনভয়ের সঙ্গেই যাব। ধন্যবাদ, ওয়ার্ডেন।' কথা বাড়ানোর আর সুযোগ না দিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন তিনি। ভুরু কুঁচকে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন, চিন্তা করছেন। মাসুদ রানার উপস্থিতি ক্রমশ জটিল ও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। যত তাড়াতাড়ি বিদায় হয় লোকটা ততই ভাল।

আরও প্রায় বিশ মিনিট পর ওয়ার্ডেনের বাংলোর দিক থেকে ডিজেল এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল। চেয়ার ছেড়ে এগোলেন তিনি, বারান্দার জাল দেয়া দরজার সামনে দাঁড়ালেন। পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে টয়োটা ল্যান্ডক্রুজার। ট্রাকের দরজায় আঁকা রয়েছে মাসুদ রানা প্রডাকশন-এর লোগো–দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা হাত, ইস্পাতের কাঁটাঅলা ব্রেসলেট পরানো হয়েছে কব্জিতে, কনুই ভাঁজ হয়ে আছে, শক্ত হয়ে আছে বাহু, বডি-বিল্ডারের মত ফুলে আছে বাইসেপ। ড্রাইভারের সীটে বসে রয়েছে রানা, পাশের সীটে ওর ক্যামেরাম্যান।

আপদ অবশেষে বিদায় হচ্ছে, ভাবলেন অ্যামব্যাসাডর। ঠোঁটে সন্তুষ্টির ক্ষীণ হাসি, হাতঘড়ির দিকে তাকালেন একবার। একটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। হেডকোয়ার্টারে হামলা শুরু হবার আগে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার জন্যে অন্তত চার ঘণ্টা সময় পাবে ওরা।

তাঁকে দেখতে পেয়ে ব্রেক করল রানা। পাশের জানালার কাচ নামিয়ে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আলি শাহ বলল আপনিও আজ চলে যাচ্ছেন,' বলল ও। 'আমরা কি সত্যিই আপনার কোনও সাহায্যে আসব না?'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. রানা,' সবিনয়ে হাসলেন অ্যামব্যাসাডর। 'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। প্লীজ, আমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না।'

রানা তাঁর অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, মেদহীন ঋজু কাঠামো, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল–সব মিলিয়ে চেহারায় এমন কিছু আছে যা ভয় পাইয়ে দেয়। বিশেষ করে মনে যদি কোন পাপ থাকে। হ্যাঁ, বিশেষ করে মনে যদি কোন পাপ থাকে। ওর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও সোজা, হাসিটা অলস। চণ্ডমণ্ড গণ্ড ভাবলেন, পশ্চিমা বা অন্যান্যদের চোখে, বিশেষ করে মেয়েদের চোখে, লোকটার চেহারা দারুণ আকর্ষণীয় বলে মনে হতে পারে, তবে তাঁর চোখে নাকটা অতিরিক্ত খাড়া, চওড়া মুখে শিশুসুলভ জ্যান্ত একটা ভাব। গুরুতর কোন হুমকি নয় মনে করে ওকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারতেন, পারছেন না শুধু চোখ দুটোর জন্যে। ওই চোখ জোড়াই তাঁর অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। সুন্দর চোখ; চীনাদের মত নয়, জাদু ও মায়ায় ভরা, তবে অত্যন্ত সতর্ক ও অন্তর্ভেদী।

আবার হাসার আগে ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, তারপর জানালা দিয়ে ভেতরে গলিয়ে দিলেন ডান হাতটা।

'বেশ, উদ্বিগ্ন হলাম না, মি. অ্যামব্যাসাডর। মনে আশা থাকল, শিগ্গির কোন একদিন আবার আমাদের দেখা হবে, তখন গল্প করার সুযোগ পাব।' গিয়ার-শিফট এনগেজ করল রানা, ডান হাতটা তুলে নাড়ল একবার, ক্যাম্পের

মেইন গেটের দিকে ছেড়ে দিল গাড়ি।

ট্রাকটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকালেন পাহাড় চূড়ার দিকে। পাহাড়ের মাথার দিকটা কুমীরের দাঁতের মত অসমান ও উঁচুনিচু।

প্রায় বিশ মাইল পশ্চিমে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল, আলোর সরু একটা রেখা এঁকেবেঁকে ছুটে [illegible] মেঘের ঝুলে থাকা পেট থেকে শুরু হল প্রবল বৃষ্টি। ঝাপসা হয়ে গেল দূরের পাহাড়গুলো।

মনে মনে চাম্বার সিংকে ধন্যবাদ দিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। এর চেয়ে ভাল সময় আর হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা উপত্যকা ভেসে যাবে বৃষ্টির পানিতে। চিউইউইয়ে যদি কোন রহস্যময় ঘটনা ঘটে, খবর পাওয়ামাত্র একটা পুলিস টিমকে তদন্তের জন্যে পাঠানো হবে, কিন্তু রওনা হবার পর তারা দেখবে রাস্তা বন্ধ। তবু যদি কোনভাবে তারা পার্কের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছুতে পারে, কোন লাভ হবে না–ফিরতি পথে রেখে যাওয়া হানাদার বাহিনীর সমস্ত ছাপ ও চিহ্ন ধুয়েমুছে যাবে তুমুল বর্ষণে।

'এখন শুধু ওরা এলেই হয়,' ব্যাকুল প্রার্থনার মত বিড়বিড় করলেন অ্যামব্যাসাডর। 'ঘটনাটা যেন আজ ঘটে, কাল নয়।' আবার হাতঘড়ি দেখলেন। এখনও দুটো বাজেনি। সূর্য ডুববে সাতটা ত্রিশে, তবে আকাশে ঘন মেঘ থাকায় আরও আগে অন্ধকার হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। 'যেন আজই ঘটে,' আবার বিড়বিড় করলেন তিনি।

বারান্দার একটা টেবিল থেকে বিনকিউলার ও 'বার্ডস অভ সাউথ আফ্রিকা' নামে একটা বই নিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। তিনি যে একজন নির্ভেজাল ন্যাচারালিস্ট, ওয়ার্ডেনের কাছে এটা প্রমাণ করার একটা তাগাদা অনুভব করছেন। এখানে এসে থাকতে চাওয়ার পিছনে সেটাই অজুহাত হিসেবে দেখানো হয়েছে।

মার্সিডিজে চড়ে আইভরি গুদামের পিছনে ওয়ার্ডেনের অফিসে চলে এলেন তিনি। নিজের ডেস্কে বসে আছে আলি শাহ। বাকি সব সিভিল সার্ভিস কর্মচারীদের মত ওয়ার্ডেনের মোট কর্ম-সময়ের অর্ধেকটাই ব্যয় হয়ে যায় পূরণ করা ফর্ম ফাইলবন্দী করতে ও বিস্তারিত রিপোর্ট লিখতে। কাগজ-পত্রের স্তূপ থেকে মুখ তুলল সে, দেখল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

'রিফ্রিজারেটর ট্রাক মেরামত হতে দেরি হবে, তাই ভাবলাম ফিগ ট্রি প্যান-এর ওয়াটার-হোল থেকে একবার ঘুরে আসি,' ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বললেন অ্যামব্যাসাডর। সহানুভূতিসূচক হাসি ফুটল ওয়ার্ডেনের ঠোঁটে, দেখল ভদ্রলোকের সঙ্গে বিনকিউলার ও ফিল্ড গাইড রয়েছে। আলি শাহের নিজেরও বার্ড-ওয়াচিং একটা নেশা, প্রকৃতি প্রেমিক যে-কোন মানুষকে ভাল লাগে তার।

'কনভয় রওনা হবার জন্যে রেডি হলেই আমার একজন রেঞ্জারকে পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে,' বলল আলি শাহ। 'তবে কনভয়টা আজ সন্ধ্যায় রওনা হতে পারবে কিনা বলতে পারছি না। ওরা বলছে, একটা ট্রাকের অলটারনেটর জ্বলে গেছে। এ-দেশে স্পেয়ার পার্টস পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার–ফরেন কারেন্সি কোথায় যে প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানি করব।'

গাড়ি নিয়ে কৃত্রিম ওয়াটার-হোলে চলে এলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। টিভিইউই হেডকোয়ার্টার থেকে এক মাইল দূরেও নয়, ছোট একটা ঢালের মাথায় মাটি খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে ওয়াটার-হোলটা, একটা উইণ্ড মিলের সাহায্যে তোলা পানি নিচের কাদাজলের পুকুরে নেমে যায়, ফলে ক্যাম্পের আশপাশ থেকে পাখি ও পশুরা এদিকে না এসে পারে না।

অবজারভেশন এরিয়ায় গাড়ি থামালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, পুকুরটা এখান থেকে দেখা যায়। কুডু-র ছোট একটা পাল পানি খাচ্ছিল, গাড়ির শব্দে ছুটে পালাল ঝোপের ভেতর।

চণ্ডমণ্ড গণ্ড এত বেশি অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে আছেন যে চোখে বিনকিউলার তোলার ইচ্ছে হলো না, যদিও ওয়াটার হোলে মেঘের মত ঘন হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে পাখির ঝাঁক। কোন কোন পাখি এত লাল যে দেখে মনে হয় আকাশ-পথে ছুটে যাচ্ছে আগুনের টুকরো। শুধু যে আইভরি কার্ভারের ছুরি হাতে থাকলে চণ্ডমণ্ড গণ্ড শিল্পী হয়ে ওঠেন তা নয়, হাতে তুলি থাকলেও ওয়াটার কালার খুব ভাল আঁকেন তিনি। তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয় হলো বুনো পাখি, ট্র্যাডিশনাল রোমান্টিক চীনা পদ্ধতিতে আঁকেন।

আজ তাঁর পাখির ওপর মন দেয়ার মানসিকতা নেই। আইভরি হোল্ডারে সিগারেট গুঁজে ধরালেন তিনি, নার্ভাস ভঙ্গিতে টান দিলেন ঘন ঘন। এই জায়গাতেই পোচারদের লিডারের সঙ্গে তাঁর দেখা হবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চারদিকে ঝোপগুলোর দিকে বার বার চোখ বুলাচ্ছেন।

আশপাশে কেউ আছে, এটা তিনি প্রথম টের পেলেন তাঁর পাশের জানালার সামনে থেকে ভেসে আসা একটা কণ্ঠস্বর শুনে। চমকে উঠে ঝট করে ঘাড় ফেরালেন গণ্ড, তাকালেন গাড়ির পাশে সদ্য উদয় হওয়া লোকটার দিকে।

লোকটার মুখে একটা কাটা দাগ, বাম চোখের কোণ থেকে ওপরের ঠোঁট পর্যন্ত লম্বা। ঠোঁটের ওদিকটা কেউ যেন টেনে তুলে ধরেছে, দেখে মনে হবে সারাক্ষণ ব্যঙ্গাত্মক ও আড়ষ্ট হাসি হাসছে লোকটা। দাগটা সম্পর্কে আগেই তাকে সাবধান করে দিয়েছে চাখার সিং। লোকটাকে চেনার সহজ একটা উপায়।

'গুচ?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। পোচার লোকটা তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। 'তুমি পিটার গুচ?'

'হ্যাঁ,' বলল লোকটা, দোমড়ানো-মোচড়ানো মুখের মাত্র অর্ধেকটায় হাসি ফুটল। 'আমি গুচ।'

গায়ের রঙ বেগুনি-কালো, তার ওপর ক্ষতটা লালচে সরীসৃপ যেন। একটু খাটো, তবে ফুলে আছে পেশীগুলো, কাঁধ দুটো অস্বাভাবিক চওড়া। শার্টটা ছিঁড়ে গেছে, কোমরের খাকি শর্টসে শুকনো কাদা লেগে রয়েছে। লোকটা যে দীর্ঘ পথ দ্রুত হেঁটে এসেছে তা বোঝা যায় হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন পা দুটো ধুলোয় ঢাকা দেখে। কড়া রোদে তার চামড়া থেকে উৎকট একটা গন্ধ বেরুচ্ছে, মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল চণ্ডমণ্ড গণ্ডের, বমির ভাব হতে পিছিয়ে এলেন তিনি। ব্যাপারটা লক্ষ করল পোচারদের লিডার, মুখে চওড়া হলো হাসিটা।

'তোমার লোকজন কোথায়?' জানতে চাইলেন অ্যামব্যাসাডর, আঙুল তুলে

পাশের ঝোপ-ঝাড়গুলো দেখিয়ে দিল গুচ।

'তুমি সশস্ত্র? তোমাদের সবার কাছে অস্ত্র আছে?' আবার জানতে চাইলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, গলায় ঝাঁঝ। গুচের হাসিতে বিনয়ের অভাব আরও প্রকট হলো, এ-ধরনের বোকার মত আজেবাজে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার কোন ইচ্ছে তার নেই। চণ্ডমণ্ড গণ্ড বুঝতে পারছেন, অকস্মাৎ স্বস্তিবোধ করায় এবং নার্ভের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বোকার মত বকবক করছেন তিনি। সিদ্ধান্ত নিলেন নিজেকে সামলে রাখতে হবে, কিন্তু ঠেকাবার আগেই পরবর্তী প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। 'কি করতে হবে তুমি জানো?'

আঙুলের ডগা দিয়ে চকচকে ক্ষতটা চুলকাল গুচ, তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'তোমরা কোন সাক্ষী রাখতে পারবে না।' চোখ দেখে চণ্ডমণ্ড গণ্ড অনুমান করলেন তাঁর কথা বুঝতে পারেনি গুচ, কাজেই আবার বললেন, 'ওদের সবাইকে তোমরা খুন করবে। পুলিস এসে যেন কথা বলার জন্যে কাউকে না পায়।'

মাথাটা একপাশে কাত করল গুচ। কিভাবে কি করতে হবে সবই তাকে ব্যাখ্যা করেছে চাখার সিং। চাখার সিং-এর আদেশ খুশিমনে পালন করতে রাজি হয়েছে সে। জিম্বাবুই পার্ক ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে তার একটা আক্রোশ আছে। মাত্র এক বছর আগে গুচের দুই ভাই ছোট একটা দলের সঙ্গে জামবেজি পেরিয়ে চিউইউইয়ে এসেছিল গণ্ডার শিকার করার জন্যে। পার্কের অ্যান্টি-পোচিং ইউনিটের সামনে পড়ে যায় তারা। লোকগুলো ছিল প্রাক্তন গেরিলা, ওদের মত তাদের কাছেও ছিল এ-কে ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। সে যুদ্ধে গুচের এক ভাই মারা পড়ল, অপর ভাইটি শিরদাঁড়ায় গুলি খেয়ে চিরকালের জন্যে পঙ্গু হয়ে গেল। আহত হওয়া সত্ত্বেও হারারেতে নিয়ে গিয়ে বিচার করা হয় তার, জেল দেয়া হয় সাত বছরের।

কাজেই পার্ক রেঞ্জারদের প্রতি তার কোন দরদ নেই। সে বলল, 'কাউকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব না।'

'শুধু দু'জন রেঞ্জারকে বাদে,' শুধরে দিয়ে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আমবু আর দোরাদে। ওদেরকে চেনো তুমি?'

'চিনি।' ওদের সঙ্গে আগেও কাজ করেছে গুচ।

'ওঅর্কশপে আছে ওরা, বড় একজোড়া ট্রাকে। তোমার লোকদের ভাল করে বুঝিয়ে দাও কথাটা, কোনভাবেই ওদের দু'জনের বা ট্রাক দুটোর কোন ক্ষতি করা যাবে না।'

'বলব।'

'ওয়ার্ডেনকে পাওয়া যাবে তার অফিসে। তার বউ আর বাচ্চা তিনটে আছে পাহাড়ের ওপর বাংলোয়। ডোমিস্টিক কম্পাউণ্ডে আছে চারজন ক্যাম্প সারভেন্ট ও তাদের পরিবার। গুলি ছোঁড়ার আগে দেখে নিয়ো জায়গাটা ঘেরাও করা হয়েছে কিনা।'

'গাছের ডালে বসে লেজ ঝুলিয়ে দিয়েছে একটা বাঁদর, একটা শিয়াল লেজটা কামড়ে ধরল—বাঁদর এখন কি করবে? সে যা করবে আপনি এখন ঠিক তাই করছেন।' গুচের চেহারায় বিরক্তি ও রাগ। 'কি করতে হবে না হবে সবই আমার

জানা। চাবার সিংই তো একবার বুঝিয়ে দিয়েছে।'

'তাহলে যাও, যেমন বলা হয়েছে করো,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে নির্দেশ দিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

জানালার দিকে হঠাৎ ঝুঁকল গুচ, দম আটকে কয়েক ইঞ্চি সরে বসলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। তর্জনীর মাথার দিকটায় ঘন ঘন বুড়ো আঙুলের নখ ঘষল গুচ, টাকার আন্তর্জাতিক সংকেত দিচ্ছে। মার্সিডিজের ড্যাশবোর্ডের দিকে হাত বাড়ালেন ম্যানেজার, একটা দেরাজ খুলে এক হাজার ডলারের তিনটে বাণ্ডিল বের করে ধরিয়ে দিলেন গুচের বাড়ানো হাতে। ক্যাম্প ওয়্যারহাউসে রাখা সমস্ত আইভরির দাম পড়ছে প্রতি কিলো প্রায় পাঁচ মার্কিন ডলার, তাইপেতে ওগুলো বিক্রি হবে প্রতি কিলো এক হাজার ডলারে।

লাভবান একা শুধু চণ্ডমণ্ড গণ্ডই হচ্ছেন না, সবুজ নোটগুলো গুচের জন্যেও বিরাট একটা সম্পদ। একবারে এত টাকা জীবনে কখনও তার হাতে আসেনি। জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকতে হয় তাকে, যে-কোন মুহূর্তে অ্যান্টি-পোচিং ইউনিটের গুলি খেয়ে প্রাণ হারাতে হতে পারে, তারপর যদি ভাল একটা হাতি মারতে পারে, সেটার দাঁত কাঁধে নিয়ে দুর্গম এলাকার ওপর দিয়ে হেঁটে নিরাপদ এলাকায় পৌঁছুতে হবে তাকে, তবেই মজুরি হিসেবে পাওয়া যাবে ত্রিশ ডলার। সে তুলনায় তিন হাজার ডলার তার কাছে ঐশ্বর্য বৈকি। বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে পাঁচ বছরে যা আয় করবে সে, এবার একদিনেই তা পেয়ে যাচ্ছে। কাজেই কয়েকজন পার্ক কর্মচারীকে খুন করতে অসুবিধে কি! তুলনা করলে, এই কাজে ঝুঁকির পরিমাণ কম। তাছাড়া, প্রতিশোধ নেয়ারও সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

লাভের হিসেব করে দু'জনেই ওরা খুশি।

'গুলির শব্দ না শোনা পর্যন্ত এখানেই আমি অপেক্ষা করব,' চাপা গলায়, প্রায় ফিসফিস করে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, শুনে গুচের একদিকের ঠোঁটে হাসি ফুটল।

'আপনাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না,' কথা দিল সে, তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের ভেতর।

দুই

ফোর-হুইল ড্রাইভ গাড়ি নিয়ে খুব কম লোকই পার্কে আসে, সে-কথা মনে রেখে নিয়মিত মেরামত করা হয় রাস্তাটা। তবে কোন ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়ো নেই, শান্ত ভাবে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। ওর টয়োটায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট রয়েছে। এড়াতে পারলে মোটেল বা হোটেলে উঠতে চায় না ও। এ-দেশে ওগুলো শুধু যে সংখ্যায় কম তা নয়, সেবা ও খাবারের মানও ভাল নয়, তারচেয়ে ওর অস্থায়ী ক্যাম্প অনেক বেশি সন্তুষ্ট করতে পারে।

আজ বিকেলটা চলার মধ্যেই থাকবে ও, সূর্য ডোবার খানিক আগে বনভূমির পছন্দসই কোন ফাঁকা জায়গা বা কোন মনোরম পাহাড়ী ঝর্ণার পাশে ক্যাম্প

ফেলবে, রাস্তা থেকে যথেষ্ট দূরে হতে হবে সেটাকে। ওর ধারণা, খুব বেশি হলে মানা পুল পর্যন্ত যেতে পারবে ওরা, আজ আর মেইন হাইওয়েতে পৌঁছুনো সম্ভব হবে না। জাম্বেজি নদীর ওপর চিরুণ্ডু ব্রিজ থেকে শুরু হয়েছে হাইওয়েটা, দক্ষিণ দিকে চলে গেছে কারোইকে ছুঁয়ে হারারে পর্যন্ত।

সঙ্গী হিসেবে পল নিউম্যান চমৎকার। তাকে ভাড়া করার সেটাও একটা কারণ। মাঝখানে মাস কয়েক বিরতি দিয়ে প্রায় এক বছর হলো একসঙ্গে কাজ করছে ওরা। পল ফ্রিল্যান্স ক্যামেরাম্যান, রানা কোন নতুন প্রজেক্ট সই করলেই তাকে ডেকে নেয়। দু'জন একসঙ্গে আফ্রিকা মহাদেশ প্রায় চষে ফেলেছে ইতিমধ্যে–নামিবিয়ার নিষিদ্ধ সৈকত স্কেলিটন কোস্ট থেকে শুরু করে দুর্ভিক্ষপীড়িত ইথিওপিয়া ও সাহারার গভীরতম প্রদেশ, কোথাও যেতে বাকি রাখেনি। যদিও প্রাণপ্রিয় বন্ধু হয়ে ওঠেনি ওরা, তবে দুর্গম এলাকায় একসঙ্গে কাজ করার ও পরস্পরকে সম্মান দেখানোর মানসিকতা তৈরি করে নিয়েছে। ওদের মধ্যে ঝগড়া বা মন কষাকষি প্রায় হয় না বললেই চলে।

আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে ছুটছে ভারি ট্রাক, খুশি মনে গল্প করছে দু'জন। যখনই কোন পাখি, পশু বা অসাধারণ কোন গাছ চোখে পড়ছে, গাড়ি থামিয়ে নোট নিচ্ছে রানা, ছবি তুলছে পল।

বিশ মাইলও এগোয়নি, রাস্তার এমন একটা অংশে পৌঁছুল, যেখানে আগের দিন রাতে হাতির বড় একটা পাল খাদ্য গ্রহণ করেছে। ডালপালা ভেঙেছে তারা, ফেলে দিয়েছে বড় আকারের অনেকগুলো গাছ। কোন কোন গাছ রাস্তার ওপর পড়েছে, ফলে গাড়ি নিয়ে এগোবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। যে-সব গাছ এখনও দাঁড়িয়ে আছে, একটারও ছাল বলে কিছু নেই–সাদা কাণ্ডগুলো নগ্ন দাঁড়িয়ে, রস ঝরিয়ে কাঁদছে।

'ব্যাটারা মহা পাজি।' আপনমনে হাসছে রানা। 'যেন রাস্তা বন্ধ করাটাই ওদের উদ্দেশ্য ছিল।' নিয়মিত কালিং অপারেশন যে একান্ত দরকার, চারদিকের ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ডই তার প্রমাণ।

অনেক কষ্টে রাস্তা থেকে নামতে পারল ওরা, ধরাশায়ী অসংখ্য গাছ এড়িয়ে ঘুরপথে এগোল। মাঝে মধ্যে নামতে হলো ট্রাক থেকে, টয়োটার টো চেইনের সঙ্গে বেঁধে বিশাল আকৃতির কাণ্ড সরাতে হলো দু'চারটে। কাজেই উপত্যকার নিচে পৌঁছুতে চারটে বেজে গেল ওদের। বনভূমির ভেতর পুবদিকে ঘুরল ওরা, এগোল মানা পুল টার্ন-অফ লক্ষ করে–যেখানটায় কালিং অপারেশনের ছবি তুলেছিল, জায়গাটা তার কাছাকাছি।

এই পর্যায়ে ওরা মগ্ন হয়ে আলোচনা শুরু করেছে, টেপে যে বিপুল ফিল্ম রয়েছে তা কতটা ভালভাবে রানার পক্ষে সম্পাদনা করা সম্ভব। রীতিমত উত্তেজিতই বলা যায় রানাকে। সমস্ত মাল-মশলা ওর হাতের মুঠোয়, এখন শুধু দৃশ্যের পর দৃশ্যগুলোকে সাজানোর ব্যাপার। লণ্ডনে ফিরেই নিজের স্টুডিওতে ঢুকবে, ডার্করুমে কাটিয়ে দেবে দিনের পর দিন।

পল কি বলছে সেদিকে একটা কান থাকলেও, চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন রানা। তাসত্ত্বেও ব্যাপারটা ওর দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছিল। গাড়ি

চালিয়ে আরও দুশো গজ এগিয়ে আসার পর ওর খেয়াল হলো, অস্বাভাবিক কিছু পাশ কাটিয়ে এসেছে। ব্রেক করল ও। মুখে কথা আটকে গেল পলের, অবাক হয়ে ঘাড় ফেরাল সে।

'কি ব্যাপার, রানা?'

'কি জানি।' সীটে মোচড় খেল রানার শরীর, পিছু হটছে ল্যান্ডক্রুজার। 'হয়তো কিছু না,' বিড়বিড় করল ও, যদিও মনে সন্দেহের একটা কাঁটা খচ খচ করে বিঁধতে শুরু করেছে।

ট্রাক থামাল রানা, নিচে নামল।

'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' অপরদিকের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকল পল।

'সেটাই তো ব্যাপার,' সমর্থন করল রানা। 'এখানে একটা অংশ একেবারে খালি।' আঙুল দিয়ে ধূলিময় রাস্তাটা দেখাল ও। ধুলোর ওপর অসংখ্য জটিল রেখা আঁকা রয়েছে–খুদে গুলতি আকৃতির রেখা, ওগুলো পাখির পা; কিছু রেখা এঁকেবেঁকে এগিয়েছে, সরীসৃপের তৈরি; আঙটা আকৃতির দাগগুলো হরিণের। শিয়াল ও বেজির ছাপগুলোও আলাদাভাবে চেনা গেল। কিন্তু রাস্তার একটা পাশে এ-সব কোন দাগই নেই। হাঁটু মুড়ে বসল রানা, জায়গাটা ভাল করে দেখল। বলল, 'দাগ বা ছাপ কেউ একজন মুছে রেখে গেছে।'

'তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে?' ট্রাক থেকে নেমে রানার পাশে চলে এল পল।

'হয়তো কিছু নেই।' সিধে হলো রানা। 'কিংবা অনেক কিছু আছে। নির্ভর করে কিভাবে তুমি ব্যাপারটাকে দেখছ।'

'জ্ঞানদান করো,' আমন্ত্রণ জানাল পল।

'শুধু মানুষ তার পদচিহ্ন গোপন করে, এবং সাধারণত শুধু যখন তাদের উদ্দেশ্য খারাপ থাকে। ভেবে দেখো, একটা ন্যাশন্যাল পার্কের মাঝখানে কোন লোকের হাঁটাহাঁটি করার কথা নয়।'

নরম মাটি পাতাসুদ্ধ ডাল দিয়ে সাবধানে ঝাড়ু দেয়া হয়েছে। জায়গাটাকে ঘিরে ঘুরছে রানা, পথ থেকে নেমে এল কিনারার ঘাসের ওপর। অ্যান্টি-ট্র্যাকিং, কোন সন্দেহ নেই–আরও অনেক লক্ষণ চোখে পড়ল। ঘাসের চাপড়াগুলো চ্যাপ্টা হয়ে আছে, একদল মানুষ ওগুলোকে ধাপ হিসেবে ব্যবহার করে এগিয়ে গেছে। লক্ষণ দেখে ধারণা করা যায়, বেশ বড়সড় একটা দল ছিল–রানা অনুভব করল, ওর বাহুর রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, শিরশির করছে ঘাড়ের পিছনটা।

রাস্তা ধরে আরও পঞ্চাশ গজ এগোবার পর প্রথম একটা মানুষের পরিষ্কার পায়ের ছাপ দেখতে পেল রানা। আরও কয়েক গজ এগিয়ে দলটা সরু একটা পথে নেমে গেছে, যে-পথে শুধু পশুরা আসা-যাওয়া করে। এখান থেকে তারা এক লাইনে এগিয়েছে, পায়ের ছাপ মোছার ঝামেলায় যায়নি। পদক্ষেপগুলো দীর্ঘ, সোজা যেন চিউইউই বেস ক্যাম্প-এর দিকে চলে গেছে। দলটা কত বড় হতে পারে আন্দাজ করার চেষ্টা করল রানা। পায়ের ছাপ গুণে ধারণা করল ষোলো থেকে বিশজনের মধ্যে হবে।

ছাপগুলো আরও দুই কি তিনশো গজ অনুসরণ করার পর থামল রানা, চিন্তা করছে: লোকগুলোর সংখ্যা ও যেদিক থেকে এসেছে, এ-সব মনে রাখলে পরিষ্কার হয়ে যায় যে ওরা আসলে জাম্বিয়ান পোচার, জাম্বেজি নদী পেরিয়ে হাতির দাঁত ও গণ্ডারের সিং সংগ্রহ করতে এসেছে। পায়ের ছাপ মুছে ফেলার কারণটাও বোঝা গেল।

রানার এখন উচিত আলি শাহকে সাবধান করে দেয়া, সে যাতে অ্যান্টি-পোচিং ইউনিট পাঠিয়ে দলটাকে বাধা দিতে পারে। কাজটা করার সহজ উপায় কি ভাবছে ও: মানা পুল-এ, রেঞ্জারের অফিসে, ফোন আছে–গাড়ি পথে এখান থেকে মাত্র এক ঘণ্টা লাগবে পৌঁছুতে। কিংবা রানা চিউইউই পার্কে ফিরে যেতে পারে, সশরীরে উপস্থিত হয়ে খবরটা দেবে।

জঙ্গলের ভেতর, খুব বেশি দূরে নয়, টেলিফোন পোলগুলো দেখতে পেল রানা, ফলে সিদ্ধান্ত নেয়াটা সহজ হয়ে গেল। পোলগুলো গাছ কেটে তৈরি করা, পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে গায়ে কালো তেলতেলে অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড মাখানো হয়েছে। প্রতি জোড়া পোলের মাঝখানে ঝুলে থাকা তামার টেলিফোন তার শেষ বিকেলের রোদে চকচক করছে–শুধু সরাসরি সামনে একজোড়া পোলের মাঝখানটা বাদে, ওখানটায় কোন তার নেই।

দ্রুত সামনে বাড়ল রানা, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

টেলিফোনের তার কেটে ফেলা হয়েছে। কাছের পোলটার সাদা সেরামিক ইনসুলেটার থেকে কাটা অংশটুকু ঝুলছে। হাত বাড়িয়ে কাটা অংশের শেষ প্রান্তটা ধরল রানা, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। কোন সন্দেহ নেই, সযত্নে কাটা হয়েছে; কাটা তারের কিনারায় প্লায়ার্সের দাগ স্পষ্ট। তাছাড়া, পোলের গোড়ায় অনেক লোকের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে।

'একদল পোচার টেলিফোন লাইন কাটবে কেন?' আপনমনে বিড়বিড় করল রানা। এখন শুধু বিস্মিত নয়, সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে ও। 'গোটা ব্যাপারটা কুৎসিত একটা চেহারা নিচ্ছে। আলিকে আমার সাবধান করতে হবে; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ভদ্রলোকদের তার বাধা দেয়া দরকার। এখন তাকে সাবধান করার একটাই উপায় আছে...।' ফেলে আসা ল্যান্ডক্রুজারের দিকে ছুটল ও।

'কি ছাই ঘটছে এখানে?' জানতে চাইল পল।

লাফ দিয়ে ট্রাকের ক্যাব-এ উঠল রানা, স্টার্ট দিল মোটর। 'ঠিক বলতে পারছি না। তবে যা-ই হোক না কেন, ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না।' পিছু হটে রাস্তা থেকে গাড়ি নামাল ও, তারপর বাঁক ঘুরতে শুরু করে আবার রাস্তায় উঠল, ফিরে যাচ্ছে উল্টোপথে।

এবার রানা দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছে, টয়োটার পিছনে রেখে যাচ্ছে ধুলোর দীর্ঘ একটা মেঘ, গতি কমিয়ে আনছে শুধু শুকনো নালাগুলোর ঢাল বেয়ে ওঠা বা নামার সময়। এক সময় ওর মনে হলো, রাস্তাটা ঘোরা পথ ধরে এগিয়েছে, পোচাররা যদি রাস্তা ছেড়ে ঢালগুলোর মাথা টপকে হাঁটে, ত্রিশ মাইল পথ কমিয়ে আনতে পারবে তারা। মনে মনে একটা হিসেব করল ও, টেলিফোনের তার কাটা

হয়েছে পাঁচ কি ছ'ঘণ্টা আগে।

একটা ব্যাপার ওর মাথায় ঢুকছে না। পোচারদের একটা দল চিউইউই হেডকোয়ার্টারে যাবে কেন! সত্যিই কি ওখানে যাচ্ছে তারা? ওদিকেই যে যাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু ওদিকে নয়, ওখানেই যাচ্ছে; তা না হলে টেলিফোন লাইন কাটবে কেন? ওদের আচরণ অদ্ভুত, রহস্যময়, অশুভ ও বৈরী। সত্যি যদি ওদের গন্তব্য চিউইউই হয়ে থাকে, এরইমধ্যে সেখানে পৌঁছে গেছে ওরা। ঘুরপথে না গিয়ে ওরা ঢালের ওপর দিয়ে গেছে, ফলে হেডকোয়ার্টার ক্যাম্পে পৌঁছে গেছে এক কি দেড় ঘণ্টা আগে।

কিন্তু কেন? ওখানে কোন ট্যুরিস্ট নেই। কেনিয়া সহ দক্ষিণের অন্যান্য দেশে পোচাররা হাতি শেষ করার পর ট্যুরিস্টদের ওপর হামলা চালায়, সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নেয় তাদের। এই দলটা হয়তো ছিনতাই বা ডাকাতি করার জন্যে গেছে। কিন্তু চিউইউইয়ে কোন ট্যুরিস্ট নেই। মূল্যবান এমন কিছু নেই যে...। হঠাৎ প্রায় শিউরে উঠল রানা। 'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল ও। 'আইভরি!' হঠাৎ গায়ের ঘাম বরফ হয়ে উঠল যেন। 'আলি,' ফিসফিস করল। 'রুমানা...বাচ্চারা...!'

রাস্তার ওপর দিয়ে যেন উড়ে চলেছে ল্যাণ্ডক্রুজার। প্রথম বাঁকটা পেরোবার সময় স্পীড একটুও কমাল না রানা। চুলের কাঁটার মত বাঁক, কোণটায় পৌঁছুতেই দেখতে পেল প্রকাণ্ড সাদা একটা গাড়ি পুরোটা রাস্তা দখল করে রেখেছে। সাথে সাথে ব্রেক করল ও, দেখামাত্র চিনতে পেরেছে ওটা রিফ্রিজারেটর ট্রাকগুলোর একটা। সংঘর্ষ বাধতে বাধতেও বাধল না। রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর নেমে গেল রানার ট্রাক, একটা বুনো ডুমুর গাছে আরেকটু হলে ধাক্কা লাগত। ড্যাশবোর্ডের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে প্রায় থেঁতলে গেল পলের শরীর।

টয়োটা থেকে লাফ দিয়ে নামল রানা। একেবারে শেষ মুহূর্তে একপাশে দাঁড়াতে পেরেছে রিফ্রিজারেটর ট্রাক, ওর টয়োটার টেইলগেইটের সামনে বাধা হয়ে। ছুটে এল ও, চিনতে পারল সিনিয়র রেঞ্জার জামবুকে। সেই রিফ্রিজারেটর ট্রাক চালাচ্ছে।

'দুঃখিত। দোষটা আমারই। তুমি ঠিক আছো তো?'

ভয়াবহ একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল, ভয়ে কাঁপুনি উঠে গেছে জামবুর শরীরে। তবে মাথা ঝাঁকাল সে, বলল, 'আমি ঠিক আছি, মি. রানা।'

'চিউইউই থেকে কখন রওনা হয়েছ তুমি?' জানতে চাইল রানা।

ইতস্তত করছে জামবু। যে-কোন কারণেই হোক, প্রশ্নটা তাকে ঘাবড়ে দিয়েছে।

'কতক্ষণ আগে?' রানা নাছোড়বান্দা।

'সঠিক বলতে পারব না...,' ঠিক এই সময় আরেকটা গাড়ির শব্দ ভেসে এল।

ঘাড় ফেরাতেই রানা দেখল, পরবর্তী বাঁক ঘুরে এগিয়ে আসছে দ্বিতীয় রিফ্রিজারেটর ট্রাক। ঢাল বেয়ে নামছে ওটা, অত্যন্ত মন্থরগতি, ড্রাইভার খুব সতর্কতার সঙ্গে চালাচ্ছে। ওটার পঞ্চাশ গজ পিছনে দেখা গেল অ্যামব্যাসাডর

যেতে চাইবেন পার্ক থেকে।' মার্সিডিজে স্টার্ট দিলেন তিনি। 'এক কাজ করুন না, কনভয়ের মাথায় চলে যান, পথ দেখান আমাদের।'

'ধন্যবাদ, মি. অ্যামব্যাসাডর।' মাথা নেড়ে পিছিয়ে এল রানা এক পা। 'কনভয়ের সঙ্গে আপনি যান। আমি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি না। চিউইউইতে এমনিতেও আমাকে যেতে হবে। সবাইকে সাবধান করা দরকার।'

মুখের হাসি নিভে গেল, রানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন অ্যামব্যাসাডর। 'কোন প্রয়োজন নেই, শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দিতে চাইছেন আপনি। সাবধান যদি করতেই চান, মানা পুল বা কারোই থেকে ফোন করলেই তো চলে।'

'আপনাকে বলিনি? টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছে ওরা।'

'মি. রানা, এ একেবারেই অসম্ভব ও অযৌক্তিক। আপনি যে ভুল করছেন এ-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। টেলিফোন লাইন অনেকভাবেই বিচ্ছিন্ন হতে পারে। আপনি শুধু শুধু...।'

'যা খুশি তাই ভাবুন আপনি,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা। 'আমি চিউইউইয়ে ফিরে যাচ্ছি।' মার্সিডিজের দিকে পিছন ফিরল ও।

'মি. রানা, আকাশের দিকে তাকান, প্লীজ।' পিছন থেকে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'মেঘগুলো কি রকম কালো দেখেছেন? আপনি এখানে কয়েক হপ্তার জন্যে আটকা পড়তে পারেন।'

'ঝুঁকিটা আমি নেব,' জানিয়ে দিল রানা। মনে মনে ভাবল, ভদ্রলোক এরকম জেদ ধরছেন কেন? পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমাকে উনি চিউইউইয়ে ফিরে যেতে দিতে চান না। কারণ কি? কিসের যেন একটা দুর্গন্ধ রয়েছে এখানে। কিছু একটা পচেছে।

দ্রুত পায়ে ল্যাণ্ডক্রুজারের কাছে ফিরে এল রানা। ট্রাকগুলোকে পাশ কাটাবার সময় লক্ষ করল, ড্রাইভারের ক্যাব থেকে রেঞ্জাররা কেউ নিচে নামেনি। দু'জনকেই গম্ভীর দেখল ও, ওকে দেখেও কথা বলল না। 'ঠিক আছে, জামবু,' বলল ও, 'তোমার ট্রাক সামনে বাড়াও, আমি যাতে তোমাকে পাশ কাটাতে পারি।'

কোন কথা বলল না জামবু, তবে রানার নির্দেশ পালন করল। তারপর দ্বিতীয় ট্রাকটাও সগর্জনে সামনে বাড়ল। সবশেষে মার্সিডিজটা ওর সামনে এসে দাঁড়াল। বিদায় জানাবার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে নাড়ল রানা। ওর দিকে চণ্ডমণ্ড গণ্ড ভাল করে তাকালেন না, তবে সাড়া দিয়ে তিনিও হাতটা তুললেন। ট্রাকগুলোর পিছু পিছু বাঁক নিল মার্সিডিস, মানা পুলের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'সর্পভুক ভদ্রলোকের বক্তব্যটা কি ছিল?' টয়োটাকে রাস্তায় ফিরিয়ে আনছে রানা, জানতে চাইল পল।

'বললেন এক ঘণ্টা আগে রওনা হবার সময় চিউইউইয়ে সব ঠিক ছিল,' জবাব দিল রানা।

'তাহলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।' কোল্ড বক্সের দিকে হাত বাড়াল পল, বিয়ারের একটা ক্যান বের করে বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। মাথা নাড়ল রানা, মন দিল

সামনের রাস্তায়। ক্যানটা নিজেই খুলল পল, চুমুক দিল লম্বা, তারপর খোশ মেজাজে মস্ত এক ঢেকুর তুলল।

দ্রুত কমে যাচ্ছে আলো, বৃষ্টির ভারি ফোঁটাগুলো উইণ্ডস্ক্রীনে পড়ে ভেঙে যাচ্ছে, তবু স্পীড কমাচ্ছে না রানা। চিউইউইয়ের পথে সর্বশেষ চালটাকে পাশ কাটানোর সময় পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। অবশ্য মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে আলোকিত হয়ে উঠছে বনভূমি। হেডলাইটের আলোয় বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে ঝাঁক ঝাঁক রূপালি তীরের মত লাগছে। প্রতিটি ফোঁটা কাচে লেগে বিস্ফোরিত হচ্ছে, তারপর স্রোতের মত নেমে আসছে, ফলে ঝাপসা হয়ে গেল উইণ্ডশীল্ড, ওয়াইপার কোন কাজে আসছে না। ভেতর দিকে ঘেমেও যাচ্ছে কাচ। হাত দিয়ে মোছার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকল রানা। মোছার পর আবার ঘেমে গেল। বিরক্ত হয়ে নিজের দিকের জানালাটা কয়েক ইঞ্চি খুলল ও, ভেতরে রাতের বাতাস ঢুকুক খানিকটা। জানালা খোলার প্রায় সাথে সাথে কুঁচকে উঠল ওর নাকের ডগা।

একই সময়ে পলও পেল গন্ধটা। 'ধোঁয়া!' অবাক হয়ে বলল সে। 'ক্যাম্প থেকে কত দূরে আমরা?'

'প্রায় পৌঁছে গেছি,' জবাব দিল রানা।

ধোঁয়ার গন্ধ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল বাতাসে। রানা ভাবল, গন্ধটা চাকরবাকরদের চুলো থেকেও আসিতে পারে।

হেডলাইটের আলোয় ওদের সামনে লাফিয়ে উঠল মেইন ক্যাম্পের গেট। প্রতিটি চুনকাম করা স্তম্ভের মাথায় ছাল ও মাংস ছাড়ানো হাতির কংকাল বসানো রয়েছে। সাইনবোর্ডের লেখাগুলো এরকম:

চিউইউই ক্যাম্পে স্বাগতম
হাতিদের সালাম নিন

তারপর ছোট হরফে লেখা হয়েছে:

সকল ভিজিটর এখানে পৌঁছামাত্র ওয়ার্ডেনের
অফিসে রিপোর্ট করবেন।

লম্বা গাড়ি-পথ বৃষ্টির পানিতে ডুবে গেছে, দু'পাশে গাঢ় কাসিয়া গাছ। বিল্ডিংগুলোর দিকে ছুটছে রানার টয়োটা, টায়ার থেকে ঘন কুয়াশার মত পানির কণা ছড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ করে ওদের নাকে ধোঁয়ার গন্ধ তীব্র ধাক্কা মারল। বাঁশ ও কাঠ পোড়ার গন্ধ, সঙ্গে আরও কি যেন আছে—মাংস বা হাড় হতে পারে, কিংবা হয়তো আইভরি। যদিও পোড়া আইভরির গন্ধ কেমন হয় জানা নেই রানার।

'আলো দেখছি না!' গম্ভীরস্বরে বলল ও, বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকার মেইন বিল্ডিংটা দেখতে পেয়েছে।

ক্যাম্পের জেনারেটর চলছে না, গোটা ক্যাম্প অন্ধকারে ডুবে আছে। তারপর খেয়াল হলো ওর, ভেজা কাসিয়া গাছগুলোর গায়ে ও বিল্ডিঙের দেয়ালগুলোয় আলোর লালচে একটা আভা নাচানাচি করছে।

'কোন একটা বিল্ডিঙে আগুন জ্বলছে।'

সীটের কিনারায় সরে এল পল। 'ধোঁয়াটা ওখান থেকে আসছে তাহলে।'

অন্ধকারের গায়ে বিরাট একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করল টয়োটার হেডলাইট, তারপর স্থির হলো প্রকাণ্ড আকৃতির একটা স্তূপের ওপর। ঝাপসা উইণ্ডস্ক্রীন, জিনিসটা যে কি প্রথম কয়েক মুহূর্ত বুঝতেই পারল না রানা। অদ্ভুত লাগছে আভাটা। মনে হলো ওটার ভেতর থেকেই বেরুচ্ছে। আরও কাছে যাবার পর, জোরাল আলো পড়ায় পুড়ে কালো ও ছাই হয়ে যাওয়া আইভরি ওয়্যারহাউসের ধ্বংসস্তূপ বলে চিনতে পারল ওটাকে। দৃশ্যটা দেখে বিস্ময়ে ও আতংকে হাঁ হয়ে গেছে রানা, গাড়ি থামিয়ে কাদা ও বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল, তাকিয়ে আছে।

আগুনের তাপে ফাটল ধরে যায় দেয়ালগুলোয়, বেশিরভাগই কাত হয়ে পড়ে গেছে। ভয়াবহ বিশাল অগ্নিকাণ্ড ছাড়া এ-ধরনের তাপ সৃষ্টি হবে না। তুমুল বর্ষণ সত্ত্বেও আগুনটা এখনও জ্বলছে, হেডলাইটের আলোয় তেলতেলা ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে মাঝে মধ্যে লাফ দিয়ে উঠছে লকলকে শিখা।

ভিজে শার্ট রানার গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে, ভিজে চুল নেমে এসে ঢেকে দিয়েছে কপাল ও চোখের অংশবিশেষ। চোখ থেকে চুল সরিয়ে ধরাশায়ী দেয়ালগুলোর দিকে হোঁচট খেতে খেতে এগোল ও। মাটিতে পড়ে থাকা ছাদ মোটা ও কালো ছাই মাত্র, কয়লা হয়ে গেছে কড়িকাঠগুলো। বৃষ্টির মধ্যেও এত বেশি উত্তপ্ত যে কাছাকাছি যেতে পারল না রানা, ফলে আন্দাজ করা গেল না কালো স্তূপের নিচে এখনও কি পরিমাণ আইভরি পড়ে আছে।

পিছিয়ে এল রানা, ছুটল ট্রাকের দিকে। ক্যাবে চড়ে হাতের তালু দিয়ে চোখ থেকে বৃষ্টি মুছল।

'তোমার সন্দেহই সত্যি হলো,' বলল পল। 'দেখে মনে হচ্ছে শালারা হানা দিয়েছে ক্যাম্পে।'

জবাব দিল না রানা। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছোটাল আলি শাহের কটেজের দিকে। 'লকার থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করো,' নির্দেশ দিল ও, প্রায় ধমকের সুরে। প্রতিবাদ না করে সীট থেকে সামনের দিকে ঝুঁকল পল, ভারি টুল-লকারের ভেতরটা হাতড়াল, ট্রাকের মেঝের সঙ্গে বোল্ট দিয়ে আটকানো ওটা। হাতে বড় একটা টর্চ নিয়ে সিধে হলো সে।

ক্যাম্পের বাকি অংশের মত ওয়ার্ডেনের কটেজও সম্পূর্ণ অন্ধকার। গাছের পাতা ও ডাল থেকে জলপ্রপাতের মত বৃষ্টি ঝরছে, হেডলাইটের আলোয় সামনের জাল ঘেরা বারান্দা আলোকিত হলো না। পলের হাত থেকে টর্চ ছিনিয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে নামল রানা। 'আলি!' চিৎকার করল ও। 'রুমানা!' ছুটে চলে এল কটেজের সদর দরজায়। দরজার অর্ধেকটাই ভেঙে চুরমার হয়ে আছে, পুরোপুরি খোলা। দৌড়ে বারান্দায় উঠে পড়ল ও। 'আলি! রুমানা!'

ফার্নিচারগুলো ভাঙা, এদিক ওদিক ছুঁড়ে উল্টে ফেলা হয়েছে। চারদিকে টর্চের আলো ফেলল রানা। ওর উপহার দেয়া আলির প্রিয় বইয়ের কালেকশন শেলফ থেকে নামানো হয়েছে, খোলা ও মেরুদণ্ড ভাঙা বইগুলো পড়ে আছে ছেঁড়া কাগজের একটা স্তূপ হয়ে।

'আলি!' চিৎকার করল রানা। 'কোথায় তুমি?'

খোলা দরজা দিয়ে ছুটে সিটিংরুমে ঢুকল রানা। এখানের দৃশ্যটা কাঁপুনি ধরিয়ে দিল ওর শরীরে। পাথরের ফায়ারপ্লেসে রেখে রুমানার সমস্ত গহনা, ফুলদানি ও চীনামাটির জিনিস-পত্র হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চুরমার করা হয়েছে। টর্চের আলো লেগে চকচক করছে টুকরোগুলো। সোফার ফোম ও কাভার ছেঁড়া হয়েছে, ছেঁড়া হয়েছে ইজিচেয়ারের ক্যানভাস। কার্পেটের ওপর মলত্যাগ করা হয়েছে, প্রস্রাব করা হয়েছে দেয়ালে।

নোংরা স্তূপ টপকে প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা, ছুটল বেডরুমের দিকে। 'আলি!' হতাশা ও রাগে কর্কশ শোনাল ওর গলা, হাতের টর্চ থেকে আলো পড়ল প্যাসেজের শেষ প্রান্তে।

শেষ মাথার দেয়ালে একটা ছবির মত কি যেন লটকানো রয়েছে, আগে ছিল না। আরও কাছে এসে রানা দেখল, গাঢ় রঙ ছড়িয়ে তৈরি করা হয়েছে নক্ষত্র আকৃতির একটা নকশা, সাদা দেয়ালের প্রায় সবটুকু জুড়ে। জিনিসটা কি বুঝতে না পেরে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর টর্চের আলো তাক করল দেয়ালের গোড়ায় পড়ে থাকা কুণ্ডলী পাকানো ছোট একটা আকৃতির দিকে।

আলি আর রুমানা তাদের একমাত্র পুত্রসন্তানের নাম রেখেছিল ওর নামের সঙ্গে মিলিয়ে–মাসুদ শাহ। পরপর দুটো মেয়ের পর প্রথম ছেলে হওয়ায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ভারি খুশি হয়েছিল। মাসুদ শাহের বয়স হয়েছিল চার বছর। রানার সামনে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে সে। চোখ দুটো খোলা, টর্চের আলোর দিকে তাকিয়ে আছে শূন্যদৃষ্টিতে।

ওরা তাকে বর্বর আফ্রিকান পদ্ধতিতে খুন করেছে। ছোট্ট মাসুদের গোড়ালি দুটো এক করে ধরে দেয়ালের গায়ে বারবার আছাড় মেরেছে, ফাটিয়ে দিয়েছে খুলি। দেয়ালের গায়ে মগজ দেখতে পেল রানা–সাদা দেয়াল ও লাল রক্তের ওপর সোনালি রঙ।

ফোঁপাচ্ছে রানা, মাসুদের ওপর ঝুঁকল। খুলিটা চুরমার হয়ে গেলেও বাপের সঙ্গে তার চেহারার মিলটা পরিষ্কার ধরা গেল। চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে, ধীরে ধীরে সিধে হলো ও, ঘুরল বেডরুমের দরজার দিকে।

দরজাটা আধ খোলা, ঠেলা দিয়ে পুরোপুরি খুলল রানা। কাতর শব্দে গুঙিয়ে উঠল কব্জাগুলো।

টর্চের আলো অনুসরণ করল রানার চোখ, আলোটা বেডরুমের চারদিকে ঘুরল। তারপর টলতে টলতে পিছিয়ে এল ও, হেলান দিল দেয়ালে, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে।

ভাইটির চেয়ে বোনগুলো বয়েসে বড়। নাসরিনের দশ আর সুরাইয়ার প্রায় আট। পা-গুলো যতদূর সম্ভব দু'দিকে মেলে বিছানার নিচে মেঝেতে নগ্ন পড়ে আছে তারা। দু'জনকেই ধর্ষণ করা হয়েছে বারবার। নাভির নিচে শুধু রক্ত আর ছেঁড়াফাড়া মাংস।

রুমানা পড়ে আছে বিছানার ওপর। ওরা তাকে পুরোপুরি নগ্ন করার

ঝামেলায় যায়নি, টান দিয়ে স্কার্টটা তুলে ফেলেছে কোমরের কাছে। হাত দুটো মাথার দু'পাশে, খাটের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধা। দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক নির্যাতনের সময় বাচ্চা মেয়ে দুটো নির্ঘাত আতংক ও রক্তক্ষরণে মারা গেছে। রুমানা সম্ভবত ওদের সবার দ্বারা নির্যাতিত হওয়া পর্যন্ত বেঁচে ছিল, তারপর তার মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়েছে ওরা।

নিজেকে বেডরুমে ঢুকতে বাধ্য করল রানা। অতিরিক্ত বিছানার চাদর কোথায় রাখা হয় জানে, কয়েকটা বের করে লাশগুলো ঢেকে দিল। মেয়েদের কাউকে ছুঁতে পারল না, আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখগুলো খোলাই থেকে গেল।

'আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখছি?' দোরগোড়া থেকে ফিসফিস করল পল। 'কোন মানুষের দ্বারা এ সম্ভব নয়! হিংস্র জানোয়ারও কি...!'

কামরা থেকে পিছিয়ে এল রানা, বন্ধ করে দিল দরজাটা। ছোট্ট মাসুদের লাশটা ঢেকে দিল চাদরে।

'আলিকে দেখলে?' পলকে জিজ্ঞেস করল ও, গলা থেকে বেসুরো আওয়াজ বেরুল।

'না।' মাথা নেড়ে দ্রুত ঘুরল পল, প্যাসেজ ধরে ছুটল। বারান্দায় হোঁচট খেল সে, তারপর লাফ দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়ল।

বাগানে বমি করছে পল, তার ওয়াক-ওয়াক শব্দ রানাকে স্থির হতে সাহায্য করল। রাগ, শোক ও ঘৃণার লাগাম টেনে ধরল ও, নিয়ন্ত্রণে আনল ভাবাবেগ। 'আলি,' নিজেকে মনে করিয়ে দিল। 'আলিকে খুঁজে পেতে হবে।'

বাকি দুটো বেডরুম ও বাড়ির অবশিষ্ট অংশ দ্রুত ঘুরে এল রানা। কোথাও পেল না বন্ধুকে : এই প্রথম ক্ষীণ একটা আশা জাগল বুকে।

আলি হয়তো পালিয়ে যেতে পেরেছে, ভাবল ও। হয়তো জঙ্গলে লুকিয়ে পড়েছে।

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে স্বস্তিবোধ করল রানা। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির দিকে মুখ তুলল। ফোঁটাগুলো ধুয়ে দিল চোখের পানি, মুখের ভেতরে তেতো ভাব। তারপর পায়ের ওপর টর্চের আলো ফেলে দেখল ওর জুতোয় লেগে থাকা রক্ত পানিতে মিশে যাচ্ছে, লালচে হয়ে উঠছে পানি। গাড়ি-পথের নুড়িপাথরে জুতোর কিনারা ঘষল ও, তারপর পলকে ডাকল। 'এদিকে এসো, আলিকে খুঁজতে হবে।'

টয়োটা নিয়ে পাহাড়ের পিছন দিকে চলে এল ওরা, চাকরবাকরদের ক্যাম্পে। সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে জায়গাটা মাটির দেয়াল ও কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়াটা অবশ্য ভেঙেচুরে নেই বললেই চলে, গেটটারও কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বেড়ার ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকল ওরা, ধোঁয়ার তীব্র গন্ধ ঢুকল নাকে। হেডলাইটের আলো পড়তে দেখা গেল কাজের লোকদের ঘরগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ধসে পড়েছে ছাদ, জানালাগুলো খালি। বৃষ্টিতে আগুন নিভে গেলেও, ধ্বংসস্তূপ থেকে এখনও এঁকেবেঁকে ধোঁয়া উঠছে।

কুঁড়েগুলোর আশপাশের মাটিতে খুদে কি যেন পড়ে রয়েছে অনেকগুলো, হেডলাইটের আলোয় মুক্তোদানার মত চকচক করছে। ওগুলো কি জানে রানা,

তবু ট্রাক থেকে নেমে কাদা থেকে তুলে নিল একটা। চকচকে তামার কার্টিজ কেস। আলোর সামনে ধরতেই হেড স্ট্যাম্পটা পড়া গেল। ৭.৬২ এমএম, তৈরি হয়েছে পুব ইউরোপে. এ/কে ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেলে ব্যবহারযোগ্য ক্যালিবার।

গুলি করে সবাইকে মেরেছে ওরা, তবে কোন লাশ রেখে যায়নি। রানা ধারণা করল, আগুন ধরাবার আগে লাশগুলো ওরা ঘরের ভেতর রাখে। এই সময় ওর দিকে ঘুরে গেল বাতাস–মাংস, হাড় ও চুল পোড়ার বোটকা গন্ধ ঢুকল নাকে।

কাদার ওপর থুথু ফেলে কুঁড়েগুলোর মাঝখান দিয়ে এগোল রানা। 'আলি!' রাতের অন্ধকারে চিৎকার করল। 'আলি, এদিকে আছো তুমি?' কিন্তু আম গাছের পাতার খসখস আলাপ, বাতাসের ফিসফিসানি আর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। এগোবার সময় ডানে বাঁয়ে টর্চের আলো ফেলল ও। তারপর দেখল, খোলা জায়গায় পড়ে রয়েছে এক লোক।

'আলি!' বলেই ছুটল রানা, লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল।

শরীরটা পুড়ে বীভৎস চেহারা পেয়েছে। খাকি পার্ক ইউনিফর্ম অর্ধেকটা ছাই হয়ে গেছে। পোড়া ধড় ও মুখের একটা পাশ দগদগে ঘায়ের মত দেখাচ্ছে। সন্দেহ নেই, জ্বলন্ত কুঁড়েঘর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে লোকটা, যেখানে তাকে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল। তবে লোকটা আলি শাহ নয়। জুনিয়র রেঞ্জারদের একজন সে।

লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, ছুটে ফিরে এল ট্রাকের কাছে।

'পেলে তাকে?' জানতে চাইল পল।

মাথা নাড়ল রানা।

'যীশু, ক্যাম্পের সবাইকে খুন করেছে ওরা। কিন্তু কেন এ-কাজ করল?'

'সাক্ষি!' ট্রাক স্টার্ট দিল রানা। 'সমস্ত সাক্ষি সরিয়ে দিয়েছে ওরা।'

'কেন? কি চায় ওরা? আমি এর কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না।'

'ওরা আইভরি নিতে এসেছিল।'

'আইভরি নিতে...কিন্তু ওরা তো ওয়্যারহাউসটাই পুড়িয়ে দিয়েছে!'

'আইভরি বের করে নেয়ার পর।'

রাস্তার ওপর উঠে এল ট্রাক, পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে রানা।

'ওরা কারা, রানা? এর জন্যে দায়ী কে?'

'কি করে বলব কারা। ডাকাত হতে পারে, পোচার হতে পারে। বোকার মত প্রশ্ন করো না।'

প্রবল শক্তিতে রাগটা মাত্র ফিরে আসতে শুরু করেছে রানার মধ্যে। এতক্ষণ বিস্ময়, শোক ও আতংকে প্রায় ভোঁতা হয়ে ছিল ওর মন। পাহাড়ের ওপর অন্ধকার বাংলোটাকে পাশ কাটিয়ে আবার নেমে এল ও মেইন ক্যাম্পে।

ওয়ার্ডেনের অফিস এখনও অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে। তবে টর্চের আলো ফেলতে দেখা গেল গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া ছাদের একটা অংশ কালো হয়ে আছে, যেন ওদিকটায় কেউ একজন জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়েছিল। গোলপাতা ভালভাবে বোনা বা

সাজানো হলে সহজে আগুন ধরে না; কিংবা হয়তো ভাল করে ধরার আগে বৃষ্টিতে নিভে গেছে আগুনটা।

আফ্রিকার বৃষ্টি তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখল। এইমাত্র তুমুল ঝরছিল, টর্চের আলোয় পঞ্চাশ গজের বেশি দেখা যাচ্ছিল না, এখন একদম নেই। এখন শুধু গাছ থেকে ঝরছে ফোঁটাগুলো। মাথার ওপর ছিন্নভিন্ন মেঘের ফাঁকে উঁকি দিল প্রথম তারা। এ-সব পরিবর্তন প্রায় লক্ষ্যই করল না রানা। ট্রাক ছেড়ে চওড়া বারান্দার দিকে ছুটল ও।

বাইরের দিকে পাঁচিল সাজানো হয়েছে চিউইউই পশুদের খুলি দিয়ে। বারান্দার ওপর দিয়ে হাঁটার সময় চোখবিহীন খুলি ও বাঁকা সিং-এর ওপর টর্চের আলো ফেলল রানা। দৃশ্যটা আরও শঙ্কিত করে তুলল ওর মনকে। এখন উপলব্ধি করতে পারছে, প্রথমে এখানেই খোঁজ করা উচিত ছিল ওর, বাংলোর দিকে ছুটে না গিয়ে।

আলি শাহের অফিসের দরজা খোলা রয়েছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেকে শক্ত করল রানা, তারপর ভেতরে পা ফেলল।

ছড়ানো সাদা কাগজে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে মেঝে ও ডেস্ক। গোটা অফিস কামরা ভাঙচুর করেছে ওরা, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ফর্ম ও ফাইলের স্তূপ। সবগুলো দেরাজ টেনে বের করে উপুড় করা হয়েছে মেঝেতে। আলির চাবিটা নিয়ে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো সেফ খুলেছে। চাবিটা এখনও তালার সঙ্গে রয়েছে, তবে সেফটা খালি।

কামরার চারদিকে ছুটোছুটি করল টর্চের আলো। তারপর স্থির হলো ডেস্কের সামনে পড়ে থাকা আকৃতিটার ওপর।

'আলি!' বিড়বিড় করল রানা। 'না...না...না!'

তিন

ফিগ ট্রি প্যান থেকে ঘুরে আসি, বলে অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ড চলে যেতেই ডেস্ক ছেড়ে উঠল আলি শাহ, অফিস থেকে বেরিয়ে চলে এল ভেহিকেল ওঅর্কশপে। এখানে অচল ট্রাকটা মেরামত করছে রেঞ্জার জামবু। জামবু মেকানিক হিসেবে ভাল নয়, তার দ্বারা মেরামতের কাজটা হবে কিনা সন্দেহ আছে তার। সকালে হয়তো তাকে মানা পুল ওয়ার্ডেনকে ফোন করতে হবে, মেকানিক পাঠানোর জন্যে।

তবে চিন্তার তেমন কিছু নেই। হাতির মাংস কোল্ড স্টোরেজে তুলে রাখা যাবে। এই মুহূর্তে ট্রাকের রিফ্রিজারেটিং ইকুইপমেন্ট প্ল্যাগের সাহায্যে জোড়া লাগানো রয়েছে ক্যাম্প জেনারেটরের সঙ্গে, শেষবার চেক করার সময় আলি শাহ দেখেছে থার্মোমিটারের কাঁটা ফ্রিজিং পয়েন্টের বিশ ডিগ্রী নিচে। মাংসগুলো প্রসেস করার পর পশুখাদ্য হিসেবে হারারের একজন ঠিকাদার বাজারজাত করবে।

কাজে ব্যস্ত, ঘর্মাক্ত কলেবর জামবুকে ওঅর্কশপে রেখে নিজের অফিসে ফিরে গেল আলি শাহ। সে বেরিয়ে যেতেই মুখ তুলল জামবু, অপর কালো রেঞ্জার সোয়ারদের সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। একটা ক্ষয়া অলটারনেটর নিয়ে কাজ করছে সে, হারারের পুরানো ও বাতিল লোহার দোকান থেকে সে-ই কিনে এনেছে। ট্রাকটার আদি অলটারনেটর, এখনও নিখুঁত ও কাজের উপযোগী, ড্রাইভিং সীটের তলায় লুকানো আছে। [illegible] বোল্ট দিয়ে [illegible] ও তার জোড়া দিতে দশ মিনিটও লাগবে না।

অফিসে ফিরে এসে রিপোর্ট লেখার একঘেয়ে কাজে মন দিল আলি শাহ। কাজের ফাঁকে একবার হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে দেখল একটা বাজতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। লাঞ্চ খেতে যাবার আগে চলতি হপ্তার রিপোর্টটা লিখে শেষ করতে চায় বলে উঠল না সে, যদিও বাড়ি ফেরার একটা ঝোঁক রয়েছে। লাঞ্চের আগে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খানিকটা সময় ব্যয় করা তার একটা অভ্যেস, বিশেষ করে ছেলেটার সঙ্গে। ঝোঁকটা দমন করে কাজ করে যাচ্ছে সে। জানে, আরও খানিক দেরি হলে রুমানা নিজেই তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দেবে। লাঞ্চটা ঘড়ির কাঁটা ধরে খাওয়াতে চায় সে। আপনমনে হাসছে আলি শাহ, দরজায় শব্দ শুনে মুখ তুলল।

হাসিটা মিলিয়ে গেল মুখ থেকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অচেনা এক লোক। পা দুটো বাঁকা ও খাটো, শরীরটা পেশীবহুল, পরনের কাপড় ছেঁড়া ও নোংরা। দুটো হাতই পিছনে, যেন কিছু লুকিয়ে রেখেছে।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল আলি শাহ। 'কে তুমি? কি চাও?'

ঠোঁট টিপে হাসল লোকটা। গায়ের রঙ কালো, তবে বেগুনি একটা ভাব আছে। হাসলে তার মুখের কাটা দাগটা আকৃতি বদলায়, হাসিটা হয়ে ওঠে আক্রোশে ভরা ও কুৎসিত।

ডেস্ক থেকে উঠে তার দিকে এগোল আলি শাহ। 'কি চাই তোমার?' আবার জিজ্ঞেস করল সে।

দোরগোড়া থেকে লোকটা বলল, 'তোমাকে।' পিছন থেকে এ/কে ফরটিসেভেন রাইফেলটা সামনে এনে আলি শাহের তলপেটে তাক করল। 'তোমাকে চাই।'

ঘরের মাঝখানে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ল আলি শাহ। হতভম্ব হলেও, প্রায় পরমুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে সে। তার রিফ্লেক্স একজন শিকারী বা সৈনিকের মতই। আর্মারির দরজা তার বাম দিকে দশ পা দূরে, লাফ দিল সেদিকেই।

পার্কের সমস্ত অস্ত্র ওখানে রাখা হয়। খোলা দরজা দিয়ে দূর প্রান্তের দেয়ালে ফায়ার আর্মস-এর র‍্যাকটা দেখতে পাচ্ছে সে। হতাশা তার পা দুটোকে লোহার মত ভারি করে তুলল, হঠাৎ করে মনে পড়ে গেছে র‍্যাকের একটা অস্ত্রও লোড করা নয়। এটা তার নিজেরই কঠিন সেফটি রুল। গান-র‍্যাকের নিচে তালা দেয়া ইস্পাতের কাবার্ডে রাখা হয় অ্যামুনিশন।

দরজার দিকে লাফ দিয়েছে, এই সময়ের ভেতরই সমস্ত চিন্তা খেলে গেল

তার মাথায়। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, রাইফেলটা তার দিকে ঘোরাচ্ছে লোকটা। দরজার কাছে পৌঁছায়নি, তার আগেই দক্ষ অ্যাক্রোব্যাট-এর মত সামনের মেঝেতে খসে পড়ল আলি শাহ, অটোমেটিক রাইফেলের এক পশলা বুলেটের নিচে নামিয়ে নিল মাথাটা।

সাবলীল ভঙ্গিতে শরীরটা গড়িয়ে দিয়ে এক লাফে সিধে হচ্ছে আলি শাহ, শুনতে পেল নিজেকে গাল দিল লোকটা। আবার দরজার দিকে ডাইভ দিল সে। বুঝে নিয়েছে, তার আক্রমণকারী দক্ষ লোক। রাইফেল ধরার ভঙ্গিটাই বলে দিচ্ছে, অত্যন্ত খুনী। কাছ থেকে ছোঁড়া প্রথম দফার বুলেটগুলো এড়াতে পারাটা ছিল অবিশ্বাস্য।

গুলিগুলো দেয়ালে লেগেছে, ঘরটা ভরে গেছে ধুলোয়, সেই ধুলোর ভেতর ডাইভ দিল আলি শাহ, মনে মনে জানে নিজেকে বাঁচানো সম্ভব নয়। এ/কে ফরটিসেভেন হাতে ওই লোক অত্যন্ত অভিজ্ঞ, দ্বিতীয়বার তাকে বোকা বানানো যাবে না। দোরগোড়ার আশ্রয় বা আড়াল তখনও তার নাগালের অনেক বাইরে, দ্বিতীয় দফার বুলেটগুলো ছুটে এল।

আলি শাহের মাথার ভেতর ঘড়িটা সচল রয়েছে, ভারসাম্য ফিরে পেতে একজন লোকের কতক্ষণ লাগে জানে সে। অটোমেটিকে দিয়ে গুলি করলে এ/কে ফরটিসেভেনের মাজল সব সময় ওপর দিকে উঠে যায়, নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না; কাজেই নামিয়ে এনে লক্ষ্যস্থির করতে এক সেকেণ্ডের বেশিরভাগটাই ব্যয় হবে তাতে। সময়ের হিসেবটা নিখুঁত হলো তার, ভয়ানক মোচড় দিয়ে একপাশে সরিয়ে আনল শরীরটাকে। কিন্তু তারপরও দেরি হয়ে গেল সামান্য।

রাইফেল ওপরে উঠবে, সে-কথা মনে রেখে নিচের দিকে লক্ষ্যস্থির করেছিল লোকটা। একটা বুলেট আলি শাহের ঊরুর মাংস চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেল, হাড় ছুঁতে পারল না, তবে দ্বিতীয় বুলেটটা তার নিতম্বের নিচের ভাঁজে ঢুকে গেল, গুঁড়িয়ে দিল ঊরুর জয়েন্ট, পেলভিস কাপ ও হেড।

আলি শাহ নিজেকে একপাশে সরিয়ে নেয়াতে বাকি তিনটে বুলেট লাগল না। যদিও বাম পা-টা একেবারেই গেছে। দরজার পাশে ধাক্কা খেল সে, চেষ্টা করল যাতে পড়ে না যায়। সবেগে ছুটে এসে ধাক্কা খাওয়ার পর গতির ঝোঁকটা ওকে দেয়ালে ঘষা খাইয়ে সামনে ঠেলে দিল, প্লাস্টারের ওপর সশব্দে আঁচড়ের দাগ ফেলল নখগুলো।

স্থির হবার পর দেখল এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, ঘরের দিকে পিছন ফিরে। তার বাম পা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়া জয়েন্ট থেকে ঝুলছে, তাল সামলাবার জন্যে হাত দুটোকে দু'দিকে লম্বা করে দিয়েছে, ক্রুসবিদ্ধ যীশুর মত।

এখনও হাসি লেগে রয়েছে মুখে, ক্লিক শব্দে রেট-অভ-ফায়ার সিলেক্টর সিঙ্গেল-শটে আনল লোকটা। অ্যামুনিশন বাঁচাতে চায় সে। প্রতিটি রাউণ্ড অনেক দাম দিয়ে কিনতে হয়েছে তাকে, বয়ে আনতে হয়েছে কয়েকশো মাইল। প্রতিটি কার্টিজ মহামূল্যবান, তাছাড়া ওয়ার্ডেন লোকটা সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছে, এখনও বেঁচে আছে তার দয়ায়। সে যে দয়ালু নয় এটা প্রমাণ করার জন্য আর মাত্র একটা বুলেট খরচা করলেই চলবে। 'এবার,' নরম সুরে বলল সে, 'এবার

তুমি মরবে।' তারপর গুলি করল আলি শাহের তলপেটে।

বুলেটের ধাক্কায় আলি শাহের ফুসফুস থেকে বিস্ফোরণের মত শব্দ করে বেরিয়ে এল বাতাস। সজোরে ধাক্কা খেল দেয়ালের গায়ে, প্রচণ্ড আঘাতে ভাঁজ হয়ে গেল কোমর, তারপর ঢলে পড়ল সামনে। যুদ্ধের সময় আগেও গুলি খেয়েছে আলি শাহ, তবে কোন বুলেটই সরাসরি বা পুরোপুরি শরীরে লাগেনি। মানসিক আঘাতটা শারীরিক আঘাতের চেয়ে প্রবল হয়ে উঠল, যতটা খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি। কোমর থেকে নিচের দিকটায় কোন সাড়া না থাকলেও, পরিষ্কার কাজ করছে মাথা। বরং সব কিছু খুব দ্রুত ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে সে।

ভান করো মরে গেছো!

দেয়াল থেকে খসে পড়ার সময় চিন্তা করল আলি শাহ। শরীরের নিচের অংশ পঙ্গু হয়ে গেছে, মনের জোর খাটিয়ে ধড়টাকে শিথিল করল। ময়দা ঠাসা ভারি বস্তার মত মেঝেতে পড়ল সে, তারপর আর এক চুল নড়ল না।

মোচড় খেয়ে একদিকে বাঁকা হয়ে রয়েছে মাথা, ঠাণ্ডা সাদা সিমেন্টে সেঁটে রয়েছে গালের একটা পাশ। স্থির পড়ে থাকল আলি শাহ। মেঝেতে লোকটার পায়ের আওয়াজ পেল সে, এগিয়ে আসছে তার দিকে। একটু পরই তার দৃষ্টিসীমায় চলে এল বুটজোড়া। ধুলোয় প্রায় ঢাকা, ওপরের অংশ পর্যন্ত খয়ে গেছে। পায়ে মোজা নেই, বোটকা একটা গন্ধে বমি পেল তার–লোকটা দাঁড়িয়ে আছে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে।

ধাতব শব্দ পেল আলি শাহ, আবার রেট-অভ-ফায়ার সিলেক্টর সরাল লোকটা। তারপরই কপালে ঠাণ্ডা মাজলের স্পর্শ অনুভব করল সে।

নোড়ো না! নিজেকে সাবধান করল আলি শাহ। এটাই তার সর্বশেষ আশা। জানে, নড়াচড়ার ক্ষীণ একটু আভাস পেলেই গুলি করবে লোকটা। লোকটাকে তার বোঝাতে হবে সে মারা গেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কামরার বাইরে চেঁচামেচির আওয়াজ হলো, তারপরই ভেসে এল অটোমেটিক রাইফেলের গর্জন। রাইফেল মাজলের চাপ আলি শাহের কপাল থেকে সরে গেল। দুর্গন্ধময় বুটজোড়া ঘুরল, মেঝে ধরে চলে গেল দরজার দিকে।

'চলে এসো, সময় নষ্ট কোরো না।' খোলা দরজা থেকে চিৎকার করল লোকটা, তার আঞ্চলিক চিনিয়ানজা ভাষা বুঝতে পারল আলি শাহ। 'ট্রাকগুলো কোথায়? দেরি না করে আইভরি তোলো।' কামরা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল জাম্বিয়ান খুনী, কামরার ভেতর একা পড়ে থাকল আলি শাহ।

এরকম আঘাতে মানুষ বাঁচে না, জানে সে। শরীরের ভেতর, তলপেটের গভীরে, রক্তক্ষরণ হচ্ছে, অনুভব করতে পারল। পাশ ফিরে ট্রাউজারের ওপরটা ঢিলে করল সে, পরমুহূর্তে নিজের বিষ্ঠার গন্ধ পেল নাকে। বুঝল, দ্বিতীয় বুলেটটা তার অন্ত্র ছিঁড়ে ফেলেছে। হাত নামিয়ে উরুর মাঝখানে আনল, চেপে ধরল ক্ষতটা। লাফ ও ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল গরম রক্ত, ভিজে গেল কব্জি পর্যন্ত।

রুমানা আর বাচ্চারা! নিজের কোন আশা নেই বুঝতে পেরে স্ত্রী ও সন্তানদের

কথা ভাবল আলি শাহ। ওদের জন্যে কিছুই কি করতে পারবে না সে? পাহাড়ের ওপর থেকে আরও গুলির শব্দ ভেসে এল, তার নিজের বাংলো ও কাজের লোকদের কম্পাউণ্ড থেকে।

গোটা একটা দল নিয়ে এসেছে ওরা, হতাশায় ছেয়ে গেল মনটা। আল্লাহ, আমার বাচ্চারা! বাবা মাসুদ, মাসুদ রে!

পাশের কামরার অস্ত্রগুলোর কথা ভাবল সে, কিন্তু জানে অতদূরে পৌঁছুতে পারবে না। যদি পারতও, যার অর্ধেক নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে, রক্ত-সাগরে ভাসছে, তার পক্ষে কিভাবে একটা রাইফেল চালানো সম্ভব হত?

ট্রাকগুলোর শব্দ পেল সে। ভারি ডিজেল এঞ্জিনের আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারল ওগুলো রিফ্রিজারেটর ট্রাক। হঠাৎ আশার একটা পরশ লাগল বুকে।

জামবু, ভাবল সে। দোরাদে···কিন্তু আশাটা বেশিক্ষণ টিকল না। পাশ ফিরে শুয়ে আছে সে, চেপে ধরে আছে বিচ্ছিন্ন একটা রগ, কামরার আরেক দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খেয়াল হলো খোলা দরজা দিয়ে বাইরেটা দেখতে পাচ্ছে।

একটা রিফ্রিজারেটর ট্রাক তার দৃষ্টিপথে এসে থামল। পিছু হটে আইভরি গোডাউনের সামনে স্থির হলো সেটা। লাফ দিয়ে নিচে নামল জামবু, নেমেই গ্যাঙলিডার লোকটার সঙ্গে হাত নেড়ে আলাপ জুড়ে দিল। মুখে কাটা দাগ, গ্যাঙলিডারকে চিনতে পারল আলি শাহ। গুরুতর আহত ও স্তম্ভিত, ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে, ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল তার।

জামবু, ভাবল সে। জামবু ওদের একজন। ষড়যন্ত্রটা তার।

বিরাট আঘাত পাবার মত ব্যাপার আসলে নয় এটা। আলি শাহ জানে শুধু পার্ক ডিপার্টমেন্টে নয়, সরকারের সব ডিপার্টমেন্টেই দুর্নীতি সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ব্যক্তিগতভাবে জামবুকে চেনে সে। গোঁয়ার ও স্বার্থপর লোক। বেঈমানী করলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, তবে এতটা নিষ্ঠুর হতে পারবে বলে ধারণা ছিল না।

হঠাৎ করে গুদামের চার ধারে, আলি শাহ যতটুকু দেখতে পাচ্ছে, দলের অন্যান্য লোকদের হাঁটাচলা শুরু হলো। তাদেরকে জড়ো করল গ্যাঙলিডার, টিম গঠন করে ভাগ করে দিল কাজ। তাদের একজন গুলি করে তালা ভাঙল, বাকি সবাই অস্ত্র রেখে দিয়ে ঢুকে পড়ল গুদামের ভেতর। আইভরির পাহাড় দেখে উল্লাসে মুখর হয়ে উঠল লোকগুলো। তারপর নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে এক লোক আরেক লোকের হাতে তুলে দিল একটা করে আইভরি, এভাবে হাত বদলের সাহায্যে ট্রাকে তোলা হচ্ছে ওগুলো।

দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে আলি শাহের। চোখের সামনে দিয়ে অন্ধকার মেঘ পার হয়ে গেল, সেই সঙ্গে মৃদু শোঁ শোঁ আওয়াজ আসছে কানে।

আমি মারা যাচ্ছি, ভাবল সে, কোন রকম ভাবাবেগ ছাড়াই। অনুভব করল অসাড় ভাবটা পঙ্গু পা থেকে উঠে আসছে বুকের দিকে, ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে।

চোখের সামনে থেকে জোর করে অন্ধকার সরাবার চেষ্টা করল সে, ভাবল স্বপ্ন দেখছে—কারণ বারান্দার নিচে রোদের মধ্যে অ্যামব্যাসাডর চঙমঙ গঙের

দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়, কোন কারণ নেই। এখনও তাঁর কাঁধে বিন-কিউলারটা ঝুলছে। হাবভাব অসম্ভব রকম শীতল ও মার্জিত। চিৎকার করে তাঁকে সাবধান করতে চাইল আলি শাহ, কিন্তু গলা থেকে বেরিয়ে আসা নরম কাতর ধ্বনি কামরা থেকে বেরুতে পারল না।

তারপর অবাক বিস্ময়ে দেখল সে, গাগুলিডার এগিয়ে এসে স্যালুট করল অ্যামব্যাসাডরকে। ভঙ্গিটা ঠিক সম্ভ্রম না, খানিকটা ব্যঙ্গাত্মকই বলা যায়, তবে কর্তৃত্ব স্বীকার করার ভাবটুকু স্পষ্ট।

গণ্ড। নিজেকে বিশ্বাস করাতে বাধ্য করল আলি শাহ। সত্যি আসলে গণ্ড। আমি আসলে স্বপ্ন দেখছি না।

তারপর ওদের কণ্ঠস্বর ভেসে এল কামরার ভেতর। ইংরেজিতে কথা বলছে ওরা।

'তোমার লোকদের তাড়া লাগাও,' অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ড বললেন। 'আইভরি লোড করতে দেরি করলে চলবে না। এই জায়গা ছেড়ে এখুনি আমি চলে যেতে চাই।'

'টাকা,' বলল গুচ। 'এক হাজার ডলার...,' তার ইংরেজি খুবই বাজে।

'তোমার পাওনা মিটিয়ে দেয়া হয়েছে,' কঠিন সুরে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আবার কিসের টাকা?'

'আমার আরও টাকা চাই। আরও এক হাজার ডলার।' অ্যামব্যাসাডরের মুখের ওপর হাসল গুচ। 'হয় আরও টাকা দিন নয়ত আমি কাজ বন্ধ করে দেব। কাজ বন্ধ করে চলে যাব আমরা, আপনাকে ফেলে যাব, ফেলে যাব আইভরি।'

'তুমি দেখছি একটা স্কাউনড্রেল!' খেঁকিয়ে উঠল চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

'স্কাউনড্রেল বুঝি না, তবে ধারণা করি আপনিও স্কাউনড্রেল–সম্ভবত।' গুচের হাসি মুখের একপাশে আরও চওড়া হলো। 'এবার ভালয় ভালয় টাকা বের করুন।'

'আমার সঙ্গে কোন টাকা নেই,' বললেন অ্যামব্যাসাডর।

'তাহলে বিদায় হই আমরা। আপনি নিজে আইভরি লোড করুন।'

'দাঁড়াও।' বোঝা গেল দ্রুত চিন্তা করছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আমার সঙ্গে সত্যি টাকা নেই। তুমি বরং আইভরি নিয়ে যাও, যেক'টা চাও–যতটা বইতে পারো।' জানেন, পোচাররা খুব কমই সঙ্গে নিতে পারবে, মাথাপিছু একটার বেশি দাঁত বইতে পারবে না। বিশজন লোক, বিশটা দাঁত। নগণ্যই বলা যায়।

প্রস্তাবটা বিবেচনা করার সময় অ্যামব্যাসাডরের দিকে তাকিয়ে থাকল গুচ। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে যতটা পারা যায় সুবিধে আদায় করাই তার উদ্দেশ্য, কাজেই শেষ পর্যন্ত মেনে নিল প্রস্তাবটা। 'গুড। আমরা তাহলে আইভরি নেব।' ঘুরতে শুরু করল সে।

তাকে থামালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'দাঁড়াও, গুচ! বাকি সবার খবর কি? ব্যবস্থা করেছ?'

'সবাই তারা মারা গেছে।'

'ওয়ার্ডেন? তার স্ত্রী ও বাচ্চারা? তারাও সবাই মারা গেছে?'

'সবাই মারা গেছে,' আবার বলল গুচ। 'মেয়েলোকটা আর তার মাইয়া দুটোও। আমার লোকেরা তিনজনের সঙ্গেই পক পক করেছে। ভারি মজার ব্যাপার। তারপর মেরেছে।'

'ওয়ার্ডেন? কোথায় সে?'

আলি শাহের অফিসের দিকে মাথা ঝাঁকাল গুচ। 'বুম বুম। আমি তাকে গুলি করেছি। শুয়োর ছানার মত মরেছে সে।' কর্কশ শব্দে হাসল। 'একেবারে নিখুঁত কাজ, কি বলেন?'

কাঁধে রাইফেল নিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে, গলা থেকে এখনও হাসির আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, তাকে অনুসরণ করে আলি শাহের দৃষ্টিপথ থেকে বেরিয়ে গেলেন অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ড।। প্রচণ্ড রাগ খানিকটা শক্তি যোগাল আলি শাহকে। পোচারের কথা থেকে বুঝে ফেলেছে তার স্ত্রী ও মেয়ে দুটোর কপালে কি ঘটেছে। ছবিগুলো এত পরিষ্কার ভেসে উঠল চোখের সামনে যেন সে নিজে ওখানে উপস্থিত ছিল। হত্যা ও ধর্ষণ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা আছে। সে-ও তো একজন আফ্রিকান, জানে আফ্রিকানরা কতখানি বর্বর হতে পারে।

রাগ থেকে পাওয়া শক্তিটা ব্যয় করল মেঝেতে ঘষা খেয়ে নিজেকে ডেস্কের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজে। জানে কোন অস্ত্র ব্যবহার করা তার দ্বারা সম্ভব নয়। অল্প যে সময়টুকু বেঁচে আছে, কোন ধরনের একটা মেসেজ রেখে যাওয়ার আশা করা যেতে পারে শুধু। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে কাগজ-পত্র। কিছু যদি লিখতে পারে, তারপর কোন ভাবে লুকিয়ে রাখতে পারে, পরে তাহলে পুলিসের হাতে পড়বে সেটা।

আহত একটা শুঁয়োপোকার মত নড়ছে সে, মেঝেতে পিঠ দিয়ে শোয়া অবস্থায়, এখনও চেপে ধরে আছে বিচ্ছিন্ন রগটা। ভাল পা-টা টেনে ভাঁজ করল, গোড়ালি চেপে ধরল মেঝেতে, মেঝের ওপর ঘষে ঠেলল নিজেকে। প্রতিবার কয়েক ইঞ্চি করে পিছলে যাচ্ছে পিঠ, পথটা পিচ্ছিল করে তুলছে তার নিজেরই রক্ত। ডেস্কের দিকে ছ'ফুট এগোবার পর একটা কাগজ পেল নাগালের মধ্যে। দেখল, খরচ লেখার খাতা থেকে ছেঁড়া একটা পাতা ওটা।

কাগজটা ছোঁয়নি, এই সময় কামরার ভেতর আলো বদলে গেল। দোরগোড়ায় কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। মাথাটা ঘোরাল সে, অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে দেখতে পেল, ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। বারান্দা হয়ে এসেছেন তিনি, তাঁর রাবার সোল ট্রেনিং শ্যু কোন শব্দ করেনি। দোরগোড়া থেকে স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। তারপর তিনি চিৎকার দিলেন, 'এখনও বেঁচে আছে! গুচ, জলদি এসো। এখনও বেঁচে আছে ও।'

দোরগোড়া থেকে সরে গেলেন তিনি, দৌড়ে নেমে যাচ্ছেন বারান্দা থেকে, এখনও চিৎকার করছেন, 'গুচ, জলদি এসো!'

সব শেষ, ভাবল আলি শাহ। আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড বেঁচে আছে সে। শরীরটা গড়িয়ে একপাশে কাত হলো, ছোঁ দিয়ে তুলে নিল কাগজটা। এক হাতে সেটা চেপে ধরল মেঝেতে, বিচ্ছিন্ন রগটা ছেড়ে দিয়ে রক্তাক্ত হাতটা বের করে আনল ট্রাউজারের ভেতর থেকে। সাথে সাথে অনুভব করল, লাফাতে শুরু

করেছে রগ, ক্ষত থেকে হড় হড় করে বেরিয়ে আসছে তাজা রক্ত।

খালি কাগজটার ওপর তর্জনী দিয়ে লিখতে শুরু করল আলি শাহ, নিজের রক্তে। ইংরেজি সি অক্ষরটা লিখল প্রথমে, যদিও ত্যাড়াবাঁকা হয়ে গেল। হঠাৎ আচ্ছন্নবোধ করল সে, ভোঁতা হয়ে গেল বোধশক্তি। তারপর সি-র পাশে লিখল এম। সিএম। ঠিক বুঝতে পারল না এম-টা ঠিকমত লেখা হয়েছে কিনা। উল্টো হয়ে গেল নাকি–ডব্লিউ? মনোযোগ দেয়া কঠিন হয়ে উঠছে। হ্যাঁ, উল্টোই লিখেছে সে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে মুছল সেটা, পাশে লিখল এম। মুহূর্তের জন্যে আঠালো রক্ত ভরা হাতটা সেঁটে গেল কাগজের গায়ে। টেনে ছাড়িয়ে নিল আবার।

সিএম এর পাশে লিখল জি, কিন্তু অস্বাভাবিক বড় হয়ে গেল সেটা। তার মাথার নির্দেশ অনুসরণ করছে না আঙুলটা। শুনতে পেল এখনও গুচকে ডাকছেন অ্যামব্যাসাডর। সাড়া দিল গুচ, তার চিৎকারটা কর্কশ ও ভীতিকর। সিএমজি...এরপর আলি শাহ লিখতে শুরু করল একটা ও, কিন্তু তার আঙুল বারবার পিছলে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে।

বারান্দায় ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ, সেই সঙ্গে গুচের গলা শুনতে পেল আলি শাহ।

'আমি তো ভেবেছিলাম মারা গেছে। দাঁড়ান, দিচ্ছি শেষ করে!'

কাগজটা বাম হাতের মুঠোয় ভরে মুঠোটা শক্ত করল আলি শাহ। তার এই হাতটায় রক্ত লাগেনি। মুঠোটা বুকের কাছে তুলে শরীরটা গড়িয়ে দিল সে, শরীরের নিচে চাপা পড়ল হাত।

গুচকে দরজায় আসতে দেখেনি সে, কংক্রিটের মেঝেতে সেঁটে রয়েছে তার মুখ। পোচার লোকটার বুটের আওয়াজ পেল, রক্তের ওপর পিছলে যাওয়ায় অদ্ভুত একটা শব্দ হলো। রাইফেল থেকেও একটা শব্দ হলো, সেফটি ক্যাচ অফ করার।

চরম এই মুহূর্তে এতটুকু ভয় পেল না আলি শাহ, শুধু বিশাল একটা বেদনা গ্রাস করল তাকে। রাইফেলের মাজলটা তার মাথার পিছনে ঠেকতে রুমানা আর বাচ্চাদের কথা ভাবল সে। এই ভেবে স্বস্তিবোধ করল যে ওরা চলে যাবার পর একা তাকে এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হবে না। খুশি লাগল এই ভেবে যে ওদের কপালে যা ঘটেছে তা তাকে কোনদিন দেখতে হবে না।

এ/কে ফরটিসেভেনের বুলেট তার খুলি গুঁড়িয়ে দেয়ার আগেই মারা যেতে শুরু করেছে আলি শাহ। খুলি ফুটো করে কপাল দিয়ে বেরুল বুলেটটা, গেঁথে গেল কংক্রিটের মেঝেতে।

'শিট!' ঘৃণা ও আক্রোশে মুখ বাঁকাল গুচ। পিছিয়ে এসে রাইফেলটা কাঁধে তুলল, মাজল থেকে এখনও সামান্য ধোঁয়া বেরুচ্ছে। 'শালা ত্যাঁদড় লোক, সহজে মরতে চায় না–একটা বুলেট বেশি খরচ করাল আমার!'

কামরার ভেতর পা দিলেন অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'ঠিক জানো, কাজটা শেষ করতে পেরেছ কিনা?'

'মাথা ফুটো করে বেরিয়ে গেছে বুলেট।' ডেস্ক থেকে চাবি তুলে নিয়ে সেফটা খুলছে সে। 'তারপরও যদি বেঁচে থাকে, আমার কিছু করার নেই।' দ্রুত হাতে

সেফটা খালি করছে সে।

লাশটার আরও সামনে চলে এলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, প্রায় হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন। যে-কোন হত্যাকাণ্ড সাংঘাতিক উত্তেজিত করে তাঁকে। তাঁর যৌন উত্তেজনা মাথাচাড়া দিয়েছে, লাশটা কোন বাচ্চা মেয়ের হলে যতটা উত্তেজিত হতেন ততটা অবশ্য নয়। কামরাটা ভরে আছে রক্তের গন্ধে। এই গন্ধটা তাঁর ভাল লাগে।

এতই মগ্ন হয়ে পড়েছেন যে খেয়াল নেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন রক্তের একটা ছোট্ট পুকুরে। তাঁর সংবিৎ ফিরল বারান্দার নিচে থেকে গুচের ডাক শুনে।

'সমস্ত আইভরি ট্রাকে তোলা হয়েছে। আমরা এখন রওনা হতে পারি।'

পিছিয়ে এলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, স্ল্যাকসের নিচের দিকে রক্ত লেগেছে দেখে প্রায় আঁতকে উঠলেন। 'চলে যাচ্ছি আমি,' গুচকে তিনি বললেন। 'তোমরা যাবার আগে আইভরি গোডাউনটা পোড়াও।'

অফিসের সেফে ব্যাংক থেকে পাঠানো ক্যানভাসের একটা ব্যাগ পেয়েছে গুচ, তাতে কর্মচারীদের বেতনের টাকা ছিল। ব্যাগের ভেতর চোখ রেখে জবাব দিল, 'ঠিক আছে। সমস্ত কিছুতে আগুন দেয়ার পর যাব আমরা।'

বারান্দা থেকে ধাপ বেয়ে নামলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, উঠে পড়লেন মার্সিডিজে। সংকেত দিলেন জামবুকে, একটু পরই রওনা হলো ট্রাক দুটো। ট্রাকের খোলে প্রথমে রাখা হয়েছে আইভরি, তার ওপর চাপানো হয়েছে হাতির মাংস। কেউ যদি উঁকি দেয়, ভেতরে কি আছে কিছুই বুঝতে পারবে না। তবে কনভয়টাকে থামাবে এমন কেউ নেই। ট্রাকের গায়ে ন্যাশনাল পার্কের ব্যাজ আঁকা আছে, ওটাই ওদেরকে রক্ষা করবে। জামবু আর দোরাদের পরনে রয়েছে খাকি ইউনিফর্ম। কোন কারণে কোথাও রোড-ব্লক থাকলে সেখানেও ওদেরকে দেরি করিয়ে দেয়া হবে না। এ-দেশের সিকিউরিটি ফোর্স রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের ধরার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকে, আইভরি নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই।

গোটা ব্যাপারটা চাথার সিঙ-এর প্ল্যান মতই ঘটল। মার্সিডিজের রিয়ার-ভিউ মিররে তাকালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। আইভরি গুদামে এরইমধ্যে দাউ দাউ আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। ফিরতি পথ ধরার জন্যে এক লাইনে দাঁড়িয়েছে পোচাররা। প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে হাতির দাঁত।

আপনমনে হাসলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। গুচের লোভ হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁর উপকারই করবে। সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, তবু যদি ধরা পড়ে ওরা, গুদামে আগুন ও পোচারদের বোঝা দেখে আইভরি গায়েব হওয়ার সুন্দর একটা ব্যাখ্যা পেয়ে যাবে পুলিস।

অ্যামব্যাসাডরের নির্দেশে আগুন ধরাবার আগে গুদামে চল্লিশটা আইভরি রাখা হয়েছে, পুলিসের ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে ছাই পরীক্ষা করা হতে পারে ভেবে।

আপনমনে এবার সশব্দে হেসে উঠলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। উল্লাস বোধ করছেন তিনি। হামলার সাফল্য, মৃত্যু ও রক্ত দর্শন, গরম করে তুলেছে তাঁকে; নিজেকে অসাধারণ শক্তিশালী লাগছে।

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, পরের বার খুনের কাজগুলো তিনি নিজে করবেন। এরকম বিশ্বাস করা খুবই স্বাভাবিক যে পরের বার বলে একটা ব্যাপার থাকবে। পরের বার, তার পরের বার, তারও পরের বার। মৃত্যু ঘটাবার শক্তি তাঁকে বেপরোয়া ও দুঃসাহসী করে তুলেছে।

চার

'আলি। হায় আল্লাহ। আলি।' পাশে বসে হাত বাড়াল রানা, কানের নিচে গলায় ক্যারটিড-এর স্পন্দন অনুভব করবে। দেখতে হয় তাই দেখা, কোন লাভ নেই জেনেও পুরানো অভ্যেসের পুনরাবৃত্তি মাত্র, কারণ আলি শাহের খুলির পিছনে বুলেটের গর্তটাই যা জানাবার জানিয়ে দিচ্ছে।

আলি শাহের চামড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মাথাটা ঘুরিয়ে ক্ষতের দ্বিতীয় মুখ দেখতে চায় রানা, কিন্তু পারছে না। কয়েক মুহূর্ত স্থির বসে থাকল, প্রবল যন্ত্রণাকর শোককে হটিয়ে দিয়ে জায়গা করে নিতে দিল ক্রোধ আর আক্রোশকে। রাগটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে ও, লালন করছে, ওটা যেন অন্ধকার রাতে মোমের শিখা। ওর আত্মার একটা অংশ ঠাণ্ডা ও খালি করে দিয়ে গেছে আলি শাহ, জায়গাটা গরম হবার সুযোগ পেল।

এক সময় উঠে দাঁড়াল রানা। সামনের মেঝেতে টর্চের আলো ফেলল, আলির জমাট বাঁধা পুরু রক্ত পেরিয়ে ঢুকল আর্মারিতে।

দরজার পাশে মেইন প্যানেলে জেনারেটরের রিমোট কন্ট্রোল। সুইচ অন করল রানা, দূর পাওয়ার হাউস থেকে ভেসে এল ডিজেল এঞ্জিনের আওয়াজ। ধীরে গতি সঞ্চার হলো এঞ্জিনে, তারপর সচল হলো জেনারেটর, জ্বলে উঠল আলোগুলো। জানালা দিয়ে দেখল, গাড়ি-পথের দু'পাশের স্ট্রীট ল্যাম্পগুলো আলো ছড়াচ্ছে, উজ্জ্বল সবুজ দেখাচ্ছে ভিজে কাসিয়া গাছগুলোকে।

সেফের তালায় এখনও ঝুলছে চাবির গোছাটা, সেটা নিয়ে আবার আর্মারিতে ঢুকল রানা। ৩৭৫ কালিং রাইফেলের সঙ্গে র‍্যাকে পাঁচটা এ/কে ফরটিসেভেনও রয়েছে। এগুলো অ্যান্টি-পোচিং টহলে বেরনোর সময় দরকার হয়, ফায়ার-পাওয়ার পোচারদের চেয়ে কম হলে চলে না। গানর‍্যাকের নিচে একটা কাবার্ডে রাখা হয় অ্যামুনিশন। ইস্পাতের দরজাটা খুলল রানা। হুকের সঙ্গে ঝুলন্ত ওয়েবিং বেল্টে এ/কে অ্যামুনিশনের চারটে ম্যাগাজিন রয়েছে।

একটা ওয়েবিং বেল্ট কাঁধে তুলল রানা, তারপর র‍্যাক থেকে হাতে নিল একটা অটোমেটিক রাইফেল। অভ্যস্ত হাতে লোড করল রাইফেলটা। সশস্ত্র ও রাগে অস্থির, ছুটে নেমে এল বারান্দা থেকে।

প্রথমে আইভরি গোডাউনটা দেখা দরকার। ওখানে তারা নির্ঘাত গিয়েছিল।

পোড়া বিল্ডিংটা চক্কর দিল রানা, স্ট্রীট ল্যাম্পের আলোয় কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা দেখছে, কোন জিনিস দৃষ্টি কাড়লেই টর্চের আলো ফেলছে সেদিকে।

নিজেকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ দিলে বুঝতে পারত, অযথা সময় নষ্ট করছে ও। বৃষ্টির পর খোলা আকাশের নিচে কোন ছাপ বা চিহ্ন থাকার কথা নয়, থাকলে আছে বারান্দার বাড়তি ছাদের নিচে। আর আছে ভারি টায়ারের দাগ, আইভরি গুদামের প্রবেশপথের সামনে।

ওগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিল না রানা, ও জানতে চায় পোচারদের সম্পর্কে, তারা গাড়ি ব্যবহার করবে না। ধীরে ধীরে আরও বড় বৃত্ত ধরে তল্লাশি চালাল ও, ক্যাম্প থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে যাওয়া পায়ের ছাপ খুঁজছে। সবশেষে মনোযোগ দিল ক্যাম্পের উত্তর প্রান্তে, কারণ প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় যে পোচাররা জাম্বেজি নদীর দিকে ফিরে গেছে।

পরিশ্রমটুকু বৃথা গেল। বৃথা যে যাবে, মনে মনে জানত রানা। বিশ মিনিট পর হাল ছেড়ে দিল ও। অনুসরণ করার মত কোন ছাপই নেই। গাছের গাঢ় ছায়ায় দাঁড়িয়ে হতাশা ও অসহায় রাগে ফুঁসতে লাগল।

গুলি করার জন্যে শত্রুদের খুঁজছে রানা, একবারও ভেবে দেখল না বিশ বা তারও বেশি পেশাদার খুনীর বিরুদ্ধে একা কতটুকু কি করতে পারবে। পল নিউম্যান একজন ক্যামেরাম্যান, সৈনিক নয়। যুদ্ধে তার কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। বাংলোর বেডরূমে ক্ষত-বিক্ষত শরীরগুলো, আলি শাহের ফুটো খুলি বার বার ভেসে উঠছে চোখের সামনে, ব্যাহত করছে ওর যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারাকে। অনুভব করল, থরথর করে কাঁপছে ও।

কাঁপুনিটাই ওকে মাথা ঠাণ্ডা করতে সাহায্য করল। বুঝতে পারল এখানে সময় নষ্ট করছে, সেই সুযোগে আরও দূরে সরে যাচ্ছে খুনীরা। নদীর দিকে গেছে ওরা, কাজেই ওদেরকে নদীপথে বাধা দিতে হবে।

ওর সাহায্য দরকার।

মানা পুল পার্ক ক্যাম্পের কথা ভাবল রানা। ওখানকার ওয়ার্ডেন একজন ভাল মানুষ। ওর সঙ্গে পরিচয়ও আছে। ওখানে পৌঁছুতে পারলে অ্যান্টি-পোচিং টিমের সাহায্য পাওয়া যাবে। দ্রুতগামী একটা বোট আছে ওখানে। বোট নিয়ে ভাটির দিকে চলে যাবে ওরা, টহল দেবে নদী পেরোবার জায়গায়, জাম্বিয়ান দিকটায় পৌঁছুবার সময় ধরে ফেলবে পোচারদের দলটাকে। ওয়ার্ডেনের অফিসের দিকে ছুটছে রানা, স্বাভাবিক যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে পারছে। মানা পুল থেকে হারারেতে ফোন করা যাবে, পুলিসকে বলবে একটা স্পটার প্লেন পাঠাতে।

যা কিছু করার দ্রুত করতে হবে এখন। দশ ঘন্টার মধ্যে নদী পেরিয়ে নাগালের বাইরে চলে যাবে দলটা। তবে আলিকে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। মিনিট কয়েক দেরি হয়ে গেলেও কিছু করার নেই, প্রিয় বন্ধুর প্রতি শেষ দায়িত্বটুকু পালন করতে হবে ওকে। অন্তত কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে যাবে তাকে।

অফিসের দোরগোড়ায় দাঁড়াল রানা। মাথার ওপর আলোটা অসম্ভব উজ্জ্বল, বীভৎস দৃশ্যটার কিছুই গোপন থাকতে দেয়নি। এ/কে রাইফেলটা নামিয়ে রেখে চারদিকে তাকাল একটা কাপড়ের খোঁজে। সামনের জানালায় সবুজ পর্দা রয়েছে, সরকারী বরাদ্দ, রোদ লেগে কালচে হয়ে গেছে, তবে লাশ ঢাকার কাজ চলে।

পর্দাটা খুলে ওয়ার্ডেনের কাছে হেঁটে এল রানা।

লাশটা অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে পড়ে আছে। মোচড়ানো একটা হাত তার বুকের নিচে চাপা পড়েছে, মুখটা ডুবে আছে জমাট বাঁধা রক্তে। ধীরে ধীরে তাকে সিধে করল রানা। লাশটা এখনও শক্ত হয়নি। মুখটা দেখে শিউরে উঠল ও. বুলেটটা বেরিয়ে গেছে ডান চোখের ওপর ছোট্ট ফুটো করে। পর্দার একটা কোণ দিয়ে মুখ থেকে রক্ত মুছে দিল ও। সযত্নে চিৎ করে শোয়াল, যেন আরাম দেয়ার চেষ্টা করছে।

ওয়ার্ডেনের বাম হাতটা শক্ত মুঠো হয়ে রয়েছে। মুঠোর ভেতর থেকে কাগজের একটা বল উঁকি দিচ্ছে দেখে আগ্রহ বেড়ে গেল রানার। আঙুলগুলো সিধে করল ও, মুঠো থেকে বের করে নিল কাগজটা।

দাঁড়াল রানা, হেঁটে এল ডেস্কের সামনে, ভাঁজ খুলে কাগজটা রাখল ওটার ওপর। দেখেই বুঝতে পারল, কিছু লেখার চেষ্টা করেছে আলি শাহ। লিখেছে নিজের রক্তে। অক্ষরগুলোর ওপর চোখ বুলাতে গিয়ে শিউরে উঠল আরেকবার।

সিএমজিও। হরফগুলো বাচ্চা ছেলের আঁকিবুকির মত, পাঠযোগ্য নয় বললেই চলে। সি-র পর অন্য একটা অক্ষর ছিল, সেটা রক্ত লেগে চাপা পড়ে গেছে, তার পাশে লেখা হয়েছে এম। প্রতিটি অক্ষর বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল রানা। কোন অর্থ খুঁজে পেল না। সিএমজিও। উঁহু, এটা কোন মেসেজ হয় কিভাবে! হয় এটা কিছুই নয়, নয়ত এর অর্থ জানা ছিল শুধু মৃত্যুপথযাত্রী একজন লোকের।

হঠাৎ অবচেতন মনে কি যেন একটা নড়ে উঠল, কি যেন একটা চেতন মনে উঠে আসার চেষ্টা করছে। ওটাকে সুযোগ দেয়ার জন্যে কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে থাকল রানা। কোন আইডিয়া বা স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্যে মনটাকে খালি করে দিলে কাজ হয়, বেশি চেষ্টা করলে বা তাড়াহুড়ো করলে উল্টোটা ঘটে। খুব কাছাকাছি এখন, মনে পড়তে যাচ্ছে, চেতন মনের ঠিক নিচেই একটা ছায়ার মত।

সিএমজিও।

চোখ খুলে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। রক্তাক্ত পায়ের ছাপ রয়েছে মেঝেতে, ওর আর খুনীদের। যদিও ছাপগুলোর কথা ভাবছে না রানা, ভাবছে ওর জন্যে রেখে যাওয়া মেসেজে কি বলেছে আলি শাহ।

হঠাৎ খেয়াল হলো, বিশেষ ও নির্দিষ্ট একটা পায়ের ছাপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। হঠাৎ বেহালার তারে টান দিলে যেমন হয়, ওর শরীরের ভেতর সেরকম হতে থাকল, যেন নার্ভগুলোয় হঠাৎ কেউ তীব্র খোঁচা মেরেছে। পায়ের ছাপটায় মাছের আঁশ।

সিএমজিও। মাথার ভেতর প্রতিধ্বনি তুলছে শব্দগুলো। পায়ের ছাপে মাছের আঁশ, অর্থবহ করে তুলছে শব্দগুলোকে। সিএমজিও। আলি শাহ লেখার চেষ্টা করেছে চণ্ডমণ্ড গণ্ড। আবিষ্কারটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল রানাকে, শীত লাগছে ওর, কাঁপুনি ধরে গেছে শরীরে।

অ্যামব্যাসাডর গণ্ড—চণ্ডমণ্ড গণ্ড। হায় আল্লাহ, কিভাবে তা সম্ভব! অথচ অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস করানোর জন্যে রক্তে লেখা হরফগুলো চোখের সামনেই

রয়েছে। আলি শাহ গুলি খাবার পর চণ্ডমণ্ড গণ্ড এখানে ছিলেন। রানাকে তিনি বলেছেন, রওনা হবার সময় সব ঠিক ছিল···মিথ্যে কথা বলেছেন তিনি। আরেকটা কথা মনে পড়ে যেতে আবার প্রচণ্ড ধাক্কা খেল রানা।

চণ্ডমণ্ড গণ্ডের নীল সুতী স্ল্যাকস ও জুতোয় রক্তের দাগ—আলি শাহের রক্ত। ওর ক্রোধ অবশেষে একটা লক্ষ্যস্থল পেয়ে গেছে, তবে এখন প্রকৃতিস্থ মন ও সতর্ক। রক্তাক্ত কাগজটা ওয়ার্ডেনের হাতে গুঁজে দিল রানা, আঙুলগুলো ভাঁজ করল ওটার চারধারে, পুলিস যাতে দেখতে পায়। তারপর সবুজ পর্দা দিয়ে লাশটা ঢাকল মাথা পর্যন্ত। দাঁড়াল রানা, কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। বন্ধুর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

'ওদের রেহাই নেই, আলি। আমি যদি বেঁচে থাকি, প্রতিশোধ নেবই। তোমাকে, রুমানাকে, তোমাদের বাচ্চাদের কোনদিন আমি ভুলব না।'

রাইফেলটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে অফিস থেকে ছুটে বেরিয়ে এল রানা, ধাপ টপকে নেমে ল্যাণ্ডক্রুজারের পাশে এসে দাঁড়াল। ওর জন্যে এখানে অপেক্ষা করছে পল।

ট্রাকের কাছে পৌঁছুতে যে সময়টুকু লাগল, তার মধ্যেই বাকি সব খুঁটিনাটি ঘটনা ধাপে ধাপে মিলে গেল ওর মনে। মনে পড়ল, চিউইউইয়ে ও আরও ক'টা দিন থাকতে পারে ধরে নিয়ে কি রকম অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন অ্যামবাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ড। তারপর যখন শুনলেন যে রানা চলে যাচ্ছে, স্বস্তির ভাবটুকুও গোপন করতে পারেননি।

বিধ্বস্ত আইভরি গোডাউনের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল রানা। কাদায় এখনও স্পষ্ট হয়ে রয়েছে ভারি টায়ারের দাগ। প্ল্যানটা সহজ, অথচ বুদ্ধির ছোঁয়া আছে। সন্দেহ করা হোক পোচারদের, কেউ যদি পিছু নেয় তো তাদের পিছু নিক, এই ফাঁকে পার্ক ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব ট্রাকে করে পাচার করা হবে আইভরি। রানার মনে পড়ল, রাস্তায় ওর সঙ্গে দেখা হতে জামবু ও অপর ড্রাইভার কি রকম অদ্ভুত ব্যবহার করেছে। কারণটা এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। চুরি করা আইভরি বহন করছিল ওরা। অদ্ভুত আচরণ তো করবেই।

ল্যাণ্ডক্রুজারে বসে হাত ঘড়ির ওপর চোখ রাখল রানা। প্রায় দশটা বাজে, রাস্তায় চণ্ডমণ্ড গণ্ড ও ট্রাকগুলোকে পাশ কাটাবার পর কমবেশি চার ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। মেইন হাইওয়েতে উঠে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে ওদেরকে কি ধরতে পারবে ও? রানা উপলব্ধি করল, এত সতর্কতার সঙ্গে প্ল্যানটা করা হয়েছে, নিরাপদ এস্কেপ রুট ও আইভরি সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা না থেকেই পারে না। ল্যাণ্ডক্রুজার স্টার্ট দিল ও। 'পালিয়ে তুমি বাঁচতে পারবে না, বেজন্মা কুকুর,' নিঃশ্বাসের সঙ্গে হিসহিস করে উঠল।

বৃষ্টির পানিতে রাস্তার অনেক জায়গা ডুবে আছে। সামনে খানা-খন্দ দেখেও স্পীড কমাল না রানা। ড্যাশবোর্ডের হাতল ধরে নিজেকে সামলাচ্ছে পল, তা না হলে ছিটকে পড়বে। প্রতি মুহূর্তে অসম্ভব ঝাঁকি খাচ্ছে ট্রাক।

'আস্তে চালাও, রানা—ধুত্তোর ছাই! মরতে চাও নাকি? কোথায় যাচ্ছি বলো তো আমরা? এত ব্যস্ততা কিসের?'

যতটা সংক্ষেপে সম্ভব, কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করল রানা।

'একজন অ্যামবাসাডরকে তুমি ছুঁতে পারবে না,' খাবি খাচ্ছে পল, শব্দগুলো কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। 'তোমার যদি ভুল হয়, ওরা তোমাকে আস্ত রাখবে না।'

'আমার ভুল হচ্ছে না,' পলকে আশ্বস্ত করল রানা। 'আর্মির মেসেজটা বাদ দিলেও, ব্যাপারটা আমি অনুভব করতে পারছি।'

উপত্যকার নিচে নামার পর ট্রাক থামাতে বাধ্য হলো রানা। আশপাশের সবগুলো ঢাল বেয়ে এখনও সবেগে নেমে আসছে পানি। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে শুকনো একটা নদীর তলা পেরিয়েছে ও, সেখানে এখন তীব্র স্রোত বইছে।

'এটা পেরোনো অসম্ভব,' ভয় পেয়ে গেল পল, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা।

লাফ দিয়ে নিচে নামল রানা, কাদায় ডুবে গেল গোড়ালি পর্যন্ত। তীব্র স্রোতের কিনারায় এসে দাঁড়াল ও। ক্রীম ঢালা কফির মত রঙ, কল কল শব্দে সবেগে ছুটে চলেছে, বয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাছের গুঁড়ি, ডালপালা ও ঝোপ-ঝাড়। প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া নদীটা।

নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা গাছ, শাখাগুলো পানির ওপর, কোন কোনটা আলোড়িত পানিকে ছুঁয়ে দিতে চাইছে। মোটা একটা ডাল ধরল রানা, তারপর নদীতে নামল। ধীরে ধীরে সামনে বাড়ছে ও, বাহুর সমস্ত শক্তি দিয়ে ধরে রাখতে হলো ডালটাকে, তা না হলে তীব্র স্রোত ছিনিয়ে নেবে ওকে। পানির টান এত বেশি যে নদীর মেঝেতে পা রাখতেই পারা যাচ্ছে না, উঠে আসছে বারবার। তবু ধীরে ধীরে নদীর গভীরতম অংশে পৌঁছে গেল রানা।

পানি এখানে ওর নিচের পাঁজর পর্যন্ত গভীর। হাতের ডালটা টান পড়া ফিশিং-রডের মত বাঁকা হয়ে আছে, ধীরে ধীরে নদীর কিনারায় উঠে এল রানা। শরীরের নিচের অংশ ভিজে গেছে, ভেজা কাপড় সেঁটে আছে গায়ে।

'যাওয়া যাবে,' পলকে বলল রানা, উঠে বসল ট্রাকের ক্যাবে।

'তুমি একটা বদ্ধ উন্মাদ!' বিস্ফোরিত হলো পল। 'ওখানে আমি মরতে যাব নাকি?'

'বেশ। চমৎকার। নেমে যাবার জন্যে দু'সেকেণ্ড সময় দেয়া হলো তোমাকে।' রানা গম্ভীর, টয়োটার গিয়ার বদলে ফোর-হুইল ড্রাইভে আনল।

'এখানে আমাকে ফেলে যাবে নাকি?' আতকে উঠল পল। 'এদিকে গিজ গিজ করছে সিংহ। আমার কি হবে?'

'সেটা তোমার সমস্যা, বন্ধু। তুমি যাচ্ছ, নাকি যাচ্ছ না?'

'ঠিক আছে, চলো। নিজেও ডোবো, আমাকেও ডোবাও।' হাত-পা গুটিয়ে নিজেকে ছোট করে আনল পল, সীটের একটা পাশ আঁকড়ে ধরল।

ঢালের ওপর দিয়ে ল্যাণ্ডক্রুজারকে নদীর দিকে গড়িয়ে দিল রানা, তারপর বাদামি পানিতে নামাল। ট্রাকটাকে খুব ধীরে গড়াচ্ছে ও। কয়েক গজ এগোতেই হুইলের লেভেল ছাড়িয়ে ওপরে উঠে এল পানি, তারপরও ট্রাকের নাক খাড়াভাবে নিচের দিকে ঝুঁকে আছে।

হুস হুস শব্দে বাষ্প উঠল, উত্তপ্ত এঞ্জিন কমপার্টমেন্টে ঢুকে পড়েছে পানি।

হেডলাইট ডুবে যেতে ম্লান হয়ে গেল আলো, ঘোলা পানিতে একজোড়া অনুজ্জ্বল আভার মত লাগল দেখতে। বনেটের সামনে একটা ঢেউ তৈরি হলো, উইণ্ডশীল্ডের লেভেল ছুঁয়ে দিয়েছে পানি। পেট্রল এঞ্জিন হলে ইতস্তত করত, বন্ধ হবার পাঁয়তারা কষত, কিন্তু বড়সড় ডিজেল এঞ্জিনটা একরোখা ভঙ্গিতে বন্যার ভেতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে। দরজা দিয়ে ভেতরে পানি ঢুকছে। অনেকটা ডুবে গেছে ওদের পা।

'তুমি সত্যি একটা পাগল!' চিৎকার করল পল, পা দুটো ড্যাশবোর্ডে তুলে ফেলল। 'আমি মায়ের কাছে ফিরে যেতে চাই।'

ট্রাকের শরীরে বাতাস আটকা পড়ায় পানির ওপর ভেসে থাকছে ট্রাক, ঘুরন্ত চাকা নদীর পাথুরে মেঝেতে কামড় বসাতে পারছে না। এবার ডিজেল এঞ্জিন খক খক করে উঠল।

'ওহ গড!' আঁতকে উঠল পল, অন্ধকার থেকে ওদের দিকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল একটা গাছ। ট্রাকের পাশে ধাক্কা খেল গাছটা, জানালার কাচ ভেঙে গেল, ঘষা খেল ট্রাকের পুরো একটা দিক।

কাত হয়ে যাচ্ছে ট্রাক, তারপর দোল খেতে খেতে স্রোতের সঙ্গে ভেসে যেতে শুরু করল। তবে আটকা পড়া বাতাস বেরিয়ে যাওয়ায় ডুবছে টয়োটা। ভেতরে সবেগে পানি ঢুকছে। দেখতে দেখতে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল ওদের।

'বেরিয়ে যাচ্ছি আমি!' চিৎকার করল পল, লাফ দিল দরজার ওপর। 'দরজা খুলছে না!' আতঙ্কে প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হয়েছে তার। পানির চাপে শক্তভাবে বন্ধ হয়ে আছে দরজা।

তারপর হঠাৎ রানা অনুভব করল টায়ারগুলো আবার নদীর তলা স্পর্শ করছে। ইতিমধ্যে স্রোতের টানে নদীর বাঁকে চলে এসেছে ওরা, ঠেলে নিয়ে চলেছে অপর পারের দিকে। এঞ্জিন এখনও সচল। মডিফায়েড এয়ার-ইনটেক পাইপ আর ফিল্টার প্রায় ক্যাবের ছাদ সমান ওপরে উঠে এল। ঠিক এ-ধরনের জরুরী অবস্থার কথা ভেবেই ওগুলো লাগিয়েছিল রানা। অগভীর পানিতে পৌঁছে উঁচু-নিচু পাথরে দাঁত বসাতে পারল হুইল, হেলেদুলে তীরের দিকে এগোল ল্যাণ্ডক্রুজার।

তীরে উঠে এল ট্রাক।

'বেঁচে আছি!' বিড় বিড় করল পল। 'ফর গডস্ সেক, বেঁচে আছি আমি!'

গাছপালার ভেতর দিয়ে, এঁকেবেঁকে এগোল ট্রাক, তারপর উঠে এল রাস্তায়। স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা।

'এরকম আর ক'টা আছে?' ঢোক গিলে জানতে চাইল পল। করুণ মৃত্যুগুলো দেখার পর এই প্রথম ক্ষীণ হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, যদিও তাতে প্রাণ থাকল না।

'মাত্র চার কি পাঁচটা,' জবাব দিল ও। 'সান্ধ্যভ্রমণ, কোন ব্যাপারই না।'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল ও। চণ্ডমণ্ড গণ্ড আর রিফ্রিজারেটর ট্রাক ওদের চেয়ে চার ঘণ্টা আগে রওনা হয়েছে। নদীটা পার হয়েছে তারা পানিতে ভরে ওঠার আগেই। গরম চকলেটের মত গলে গেছে এদিকের মাটি। কালো এই মাটির

কুখ্যাতি আছে, ভিজে গেলে গাড়ির চাকা আটকে দেয়। স্পীড কমাতে বাধ্য হলে বিপদে পড়তে হতে পারে।

'সামনে নদী,' সাবধান করল রানা। সরু হয়ে গেছে সামনের রাস্তা, দু'পাশের ঝোপ ঘন হয়ে সরে এসেছে। 'তোমার লাইফ জ্যাকেটটা পরে নাও।'

'এবার আমি ভয়েই মরে যাব।' রানার দিকে ফিরল পল, ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের আভায় ফ্যাকাসে দেখাল তাকে। 'কথা দিচ্ছি রোববারে চার্চে যাব, শিরনি দেব মসজিদে…।'

'যেভাবে ধরনা দিচ্ছ…,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে আশ্বস্ত করল রানা।

আফ্রিকার আকস্মিক বন্যা যেমন হঠাৎ শুরু হয় তেমনি হঠাৎই শেষ হয়। বৃষ্টি থেমেছে প্রায় দু'ঘণ্টা আগে, উপত্যকার ঢালগুলো ইতিমধ্যে প্রায় শুকিয়ে এসেছে। নদীর কিনারায় এসে ওরা দেখল, এখন যেখানে পানি রয়েছে তার ছ'ফুট ওপরে ভেজা দাগ। এবার নদী পেরুতে তেমন কোন অসুবিধে হলো না। অপর পারে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল পল।

'কে বলে প্রার্থনায় কাজ হয় না? চালিয়ে যাও, পল।'

পরবর্তী নদীটা পেরুতেও কোন অসুবিধে হলো না।

চল্লিশ মিনিট পর মানা পুল ক্যাম্পে পৌঁছে গেল ওরা, ওয়ার্ডেনের বাংলোর সামনে ট্রাক থামাল রানা। গাড়িতে বসে হর্নের বোতামে চাপ দিয়ে রাখল পল, আর রানা দু'হাতে ঘুসি মারল দরজায়।

জাল দিয়ে ঘেরা বারান্দায় বেরিয়ে এল ওয়ার্ডেন, পরনে শুধু আন্ডারপ্যান্ট। 'কে? কারা?' শোনা ভাষায় জানতে চাইল সে। 'কি ঘটছে কি এখানে?' রোগা-পাতলা গড়ন, পাকানো রশির মত পেশী, বয়েস চল্লিশ। কাচা ঘুম ভাঙানোয় এই মুহূর্তে রেগে থাকলেও আব্বাস উলুম্বু এমনিতে শান্ত মেজাজের হাসি খুশি লোক।

'আব্বাস? আমি রানা,' গলা চড়াল রানা। 'সাংঘাতিক একটা বিপদ ঘটেছে হে। বেরিয়ে এসো, কাজ আছে।'

আব্বাস উলুম্বু রানার মুখে টর্চের আলো ফেলল। 'কি ব্যাপার, রানা সাহেব? কি বিপদ ঘটল আবার?'

অনর্গল শোনায় জবাব দিল রানা, 'সশস্ত্র পোচারদের বড় একটা দল চিউইউই ক্যাম্পে হামলা করেছে। আলি শাহ আর তার পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলেছে তারা। স্টাফদেরও কেউ বেঁচে নেই।'

'হায় আল্লাহ!' চোখ থেকে ঘুমের শেষ রেশটুকু মিলিয়ে গেল, হাঁ করে তাকিয়ে থাকল আব্বাস উলুম্বু।

'আমার ধারণা, ওরা জাম্বিয়া থেকে এসেছিল,' বলে চলেছে রানা। 'আমার হিসেবে, জাম্বেজি নদী পেরোবার জন্যে এখান থেকে বিশ মাইল ভাটির দিকে যাবে ওরা। ওদেরকে বাধা দেয়ার জন্যে তোমার অ্যান্টি-পোচিং টিমকে পাঠাতে হবে।'

সমস্ত তথ্য দ্রুত বলে গেল রানা–দলের আনুমানিক লোক সংখ্যা, কি ধরনের অস্ত্র বহন করছে, চিউইউই থেকে কখন রওনা হয়ে কোনদিকে যাচ্ছে। তারপর

জানতে চাইল, 'হারারেতে ফিরে যাবার পথে রিফ্রিজারেটর ট্রাকগুলো এদিক দিয়ে গেছে কিনা জানো তুমি?'

'আউটার দিকে,' নিশ্চিত করল আব্বাস উলুম্বু। 'ঢল নামার ঠিক আগে নদী পেরিয়েছে ওরা। ওদের সঙ্গে একজন সিভিলিয়ান ছিলেন, নীল মার্সিডিজ নিয়ে এক চীনা সাহেব। একটা ট্রাক মার্সিডিজটাকে টো করছিল—এত দামি গাড়ি অথচ কাদায় কোন কাজের না।' কাপড় পরতে পরতে কথা বলছে সে। 'এখন আপনি কি করতে চান, রানা সাহেব? আলির সঙ্গে আপনার যে কী সম্পর্ক ছিল সে তো আমি জানি। আমাদের সঙ্গে গেলে বুড়বাকদের গুলি করার একটা সুযোগ পেতে পারেন।' আফ্রিকায় রানার অতীত ও বর্তমান ভূমিকা সম্পর্কে প্রায় সবই জানে সে।

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি মার্সিডিজ আর ট্রাকগুলোকে ধরতে চাই,' বলল ও।

'বুঝলাম না, রানা সাহেব।' জুতোর ফিতে বাঁধছিল, হাত দুটো স্থির হয়ে গেল আব্বাসের, অবাক হয়ে মুখ তুলল।

'এখন ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, উলুম্বু। শুধু জেনে রাখো, গোটা ব্যাপারটাই আলিকে নিয়ে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।' আইভরি আর অ্যামব্যাসাডর সম্পর্কে আব্বাস উলুম্বুকে এখুনি কিছু বলা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না রানার হাতে প্রমাণ আসছে।

কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর মাথা ঝাঁকাল আব্বাস উলুম্বু। 'ঠিক আছে, রানা সাহেব। আপনার হয়ে কাজটা করব আমি, নদী পেরোবার আগেই বুড়বাক খুনীদের ধরব,' প্রতিশ্রুতি দিল সে। 'আপনি আপনার পথে যান, যা করতে চান করুন।'

জাম্বেজি নদীর তীর থেকে বিদায় নিল রানা। মানা পুল-এর ওয়ার্ডেন তার রেঞ্জারদের নিয়ে অ্যাসল্ট বোটে উঠছে।

কাদায় কনভয়ের দাগ এবার আরও স্পষ্ট দেখল রানা। হেডলাইটের আলোয় এত তাজা মনে হলো, যেন কয়েক মিনিট আগে এখান দিয়ে গেছে ওরা। সন্দেহ নেই তুমুল বর্ষণের পর তৈরি হয়েছে দাগগুলো।

একটা ট্রাক যে মার্সিডিজটাকে টো করে নিয়ে যাচ্ছে, তারও প্রমাণ পাওয়া গেল। মাঝে মাঝে গাড়ি দুটোর মাঝখানের রশি কাদা স্পর্শ করেছে। মার্সিডিজকে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে, কাজেই গতি খুব মন্থর হবে ওদের। খানিকটা সন্তুষ্টবোধ করল রানা। কনভয়ের সঙ্গে ওর দূরত্ব নিশ্চয়ই দ্রুত কমে আসছে। ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, আশা করছে অন্ধকারের ভেতর মার্সিডিজের টেইল-লাইটের লালচে আভা দেখতে পাবে। তাকিয়ে আছে, নিজের অজান্তেই হাতটা চলে গেল দুই সীটের মাঝখানে রাখা এ/কে ফরটিসেভেনের ওপর।

ব্যাপারটা লক্ষ করল পল, নরম গলায় সাবধান করে দিল ওকে। 'বোকার মত কিছু করে বোসো না, রানা। তোমার হাতে কোন প্রমাণ নেই। সন্দেহের-বশে তুমি একজন অ্যামব্যাসাডরের খুলি উড়িয়ে দিতে পারো না। মাথা ঠাণ্ডা রাখো।'

একসময় সন্দেহ হলো, যতটা মনে করেছে কনভয়ের কাছ থেকে তারচেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে ওরা। মাঝরাতের পর গ্রেট নর্থ রোড-এ এসে পৌঁছুল টয়োটা। এই হাইওয়ে উত্তর দিকে জাম্বেজি নদীর ওপর চিরাণ্ডু ব্রিজ পেরিয়েছে, আর দক্ষিণে ঢালগুলোর ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে হারারে পর্যন্ত।

সঙ্গম মোড়ে ট্রাক থামিয়ে লাফ দিয়ে নামল রানা, হাতে টর্চ। ধরে নিতে হয় কনভয়টা দক্ষিণে ঘুরে হারারের দিকে চলে গেছে। তাজা হাতির মাংস ও আইভরি ভরা বিশাল দুটো সরকারী ট্রাক নিয়ে জিম্বাবুই ও জাম্বিয়ান কাস্টমস পোস্ট পেরোবার ঝুঁকি কেউ নেবে না।

প্রায় সাথে সাথে নিজের ধারণার পক্ষে প্রমাণ পেয়ে গেল রানা। ট্রাক আর মার্সিডিজের চাকায় লেগে থাকা কালো কাদা শক্ত হয়ে গিয়েছিল, হাইওয়ের পরিচ্ছন্ন মেঝেতে কিছু কিছু ঝরে পড়েছে।

'দক্ষিণে,' বলল রানা, আবার উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। 'ওরা দক্ষিণে গেছে।'

'কিন্তু কতক্ষণ আগে গেছে? এখন তারা কতদূরে?'

'বেশি দূরে হতে পারে না। দূরত্ব প্রতি মিনিটে কমে আসছে।'

'আচ্ছা, ধরো, ওদেরকে আমরা পেলাম। তারপর কি হবে?'

ল্যাণ্ডক্রুজারের স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা, প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

পলও নাছোড় বান্দা, আবার জিজ্ঞেস করল সে।

'আগে ওদের ধরি, তারপর দেখতে পাবে কি হয়,' জবাব দিল রানা।

স্পীডমিটারের কাঁটা নব্বুই-এ পৌঁছুল। হাইওয়ের কালো মেঝেতে ভারি চাকাগুলো শোঁ শোঁ আওয়াজ করছে।

'সামনেই পাব ওদের, কাছে চলে এসেছি,' বিড়বিড় করল রানা। কথাটা শেষ হতেই হেডলাইটের আভা দেখতে পেল সামনে।

রানার হাত চলে গেল রাইফেলে।

নার্ভাস ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকাল পল। 'ফর গডস সেক, রানা। তোমাকে আমার উদ্ভ্রান্ত লাগছে। তুমি কিছু করে বসলে আমিও ফেঁসে যাব। আগেই বলে রাখছি, আমি ভাই খুন-খারাবির মধ্যে নেই। যতটুকু শুনেছি, চিকুরুবি জেলখানাকে ঠিক ফাইভ-স্টার হোটেল বলা যায় না।'

সামনের আলোটা আরও কাছে চলে এল। ল্যাণ্ডক্রুজারের শক্তিশালী স্পটলাইট অন করল রানা। পরমুহূর্তে হতাশায় প্রায় ককিয়ে উঠল। সাদা ও উঁচু রিফ্রিজারেটর ট্রাকের কাঠামো দেখতে পাবে বলে আশা করেছিল, তার বদলে দেখল দৈত্যাকার একটা ম্যাক ট্রাক–বিশ টনী, পিছনে বাঁধা প্রায় সমান আকৃতির আট টনী একটা ট্রেইলর। ট্রাকের খোল আর ট্রেইলরের শরীর, দুটোই হেভী-ডিউটি সবুজ নাইলন তারপুলিন দিয়ে ঢাকা ও আষ্টেপৃষ্ঠে রশি দিয়ে বাঁধা–ভেতরের কার্গো যাতে নড়াচড়া না করে। হাইওয়ে থেকে সরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রাকটা, মুখ করে আছে চিরুণ্ডু ব্রিজের দিকে।

ট্রেইলরটাকে ঘিরে তিনজন লোক কাজ করছে। মনে হলো রশিগুলো টেনে-

টুলে বসাচ্ছে, তারগুলিন যাতে জায়গামত থাকে। স্পটলাইটের আকস্মিক উজ্জ্বলতা স্থির পাথর করে দিল ওদেরকে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকল দ্রুতগতি ল্যাণ্ডক্রুজারের দিকে।

দু'জন লোক কালো আফ্রিকান, রঙচটা ওভারঅল পরে আছে। তৃতীয় জনকে অভিজাত শ্রেণীর কেউ বলে মনে হলো, খাকি সাফারি সুটে দারুণ মানিয়েছে। তাকেও কালো বলা চলে, তবে শ্যামলা বলাই ঠিক। মুখে দাড়ি, মাথায় পাগড়ি। সম্ভবত ভারতীয় বংশোদ্ভূত আফ্রিকান। আরও কাছে আসার পর লোকটাকে শিখ বলে চিনতে পারল রানা। তার দাড়ি সযত্নে পাক খাইয়ে ওপর দিকে তোলা হয়েছে, ঢুকে গেছে পাগড়ির ভাঁজে।

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সামনে যেই ল্যাণ্ডক্রুজার থামাল রানা, আফ্রিকান দু'জনের উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কথা বলে উঠল শিখ লোকটা। তিনজনই তারা তাড়াহুড়ো করে ট্রাকের সামনে চলে এসে ওপরে উঠে পড়ল।

'এক মিনিট দাঁড়ান!' চিৎকার করল রানা, লাফ দিয়ে নামল ল্যাণ্ডক্রুজার থেকে। 'আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।' শিখ লোকটা এরইমধ্যে হুইলের পিছনে বসে পড়েছে।

'থামুন!' আবার অনুরোধ করল রানা, ক্যাব-এর পাশে চলে এল।

ওর মাথা থেকে পাঁচ ফুট ওপরে রয়েছে শিখ লোকটা, জানালা দিয়ে মাথা বের করে ঝুঁকে পড়ল নিচের দিকে, রানার ওপর চোখ। 'বলুন, কি ব্যাপার?'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত,' বলল রানা। 'আপনারা কি বড় এক জোড়া ট্রাককে পাশ কাটিয়েছেন?'

জবাব না দিয়ে তাকিয়ে থাকল শিখ লোকটা।

রানা আবার বলল, 'খুব বড় ট্রাক-দেখতে না পাবার কথা নয়। তিনটে গাড়ির একটা কনভয়, সঙ্গে একটা নীল মার্সিডিজ সেলুনও আছে।'

মাথাটা ভেতরে গলিয়ে নিয়ে আফ্রিকান দু'জনের সঙ্গে কথা বলল শিখ। এমন একটা আঞ্চলিক ভাষা, বুঝতে পারল না রানা। জবাব পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবার অবস্থা, লক্ষ করল ট্রাকের সামনের ডোর প্যানেলে একটা কোম্পানীর লোগো আঁকা রয়েছে।

চাখার সিং লিমিটেড
ইমপোর্ট অ্যাণ্ড এক্সপোর্ট
পি.ও. বক্স জিরোফাইভনাইন লিলঙ্গুয়ে
মালাবি

জাম্বিয়া, তাঞ্জানিয়া আর মোজাম্বিক, এই তিনটে বড় দেশের মাঝখানে মালাবি একটি ছোট্ট সার্বভৌম রাষ্ট্র। পাহাড় নদী আর লেক নিয়ে ভারি সুন্দর একটা দেশ। দারিদ্র্যপীড়িত ও স্বৈরশাসনাধীন আফ্রিকা মহাদেশের যে-কোন রাষ্ট্রের মানুষ যতটা সচ্ছল ও সুখী হতে পারে, একনায়ক অশীতিপর বৃদ্ধ হেস্টিং বান্দা-র অধীনে মালাবির নাগরিকরাও ঠিক ততটা সচ্ছল ও সুখী।

'মি. সিং, সাংঘাতিক তাড়া আছে আমার,' গলা চড়িয়ে বলল রানা। 'ট্রাকগুলো দেখে থাকলে বলুন আমাকে, প্লীজ।'

জানালা দিয়ে ঝট করে মাথা বের করল আবার শিখ লোকটা, চেহারায় বিস্ময় ও সতর্কতা। 'আপনি আমার নাম জানলেন কিভাবে?' কর্কশস্বরে জানতে চাইল সে, ইংরেজিতে।

ইঙ্গিতে লোগোটা দেখিয়ে দিল রানা।

'বাহ্। আপনার দেখছি ঈগল পাখির চোখ, নেভার মাইণ্ড।' মনে হলো স্বস্তি ফিরে পেয়েছে শিখ লোকটা। 'হ্যাঁ, আমার লোকেরা মনে করিয়ে দিল যে এক ঘণ্টা আগে দুটো ট্রাক আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে গেছে। দক্ষিণে যাচ্ছে ওগুলো। তবে ওগুলোর সঙ্গে আমরা কোন মার্সিডিজ দেখিনি। এ-ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত আমরা। ছিল না, কোন মার্সিডিজ ছিলই না।'

ম্যাক ট্রাক স্টার্ট দিল চাখার সিং। 'আপনার উপকারে লাগতে পেরে খুশি আমি। আপনার মত আমারও খুব তাড়া আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িতে, লিলঙ্গুয়েতে ফিরতে হবে আমাকে। ফেয়ারওয়েল, মাইফ্রেণ্ড—সেফ জার্নি অ্যাণ্ড হ্যাপি ল্যাণ্ডিংস।' চকচকে হাসি উপহার দিল রানাকে, হাত নাড়ল, তারপর ছেড়ে দিল ট্রাক।

লোকটার আচরণে ও রসিকতার ভেতর ফাঁপা কি যেন আছে বলে সন্দেহ হলো রানার। ভারি কার্গো ঠাসা ট্রেইলরটা সগর্জনে পাশ কাটাচ্ছে ওকে, ইস্পাতের একটা রড ধরে টেইলগেইটের নিচের পাদানিতে উঠে পড়ল লাফ দিয়ে। দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাণ্ডক্রুজারের হেডলাইট থেকে যথেষ্ট আলো পাওয়া গেল, এক জোড়া রডের মাঝখানে হাত গলিয়ে তারপুলিনের কিনারা উঁচু করে দেখে নিল ভেতরে কি আছে।

ভেতরে মনে হলো শুধু চটের বস্তা। একটা বস্তায় স্টেনসিল করা, লেখাগুলো পড়া গেল—শুকনো মাছ। কোন দেশের প্রডাক্ট পড়া গেল না, নামটা অস্পষ্ট। বস্তার ভেতর যে শুকনো মাছ আছে, সাক্ষি দিল রানার নাক। আধ পচা মাছের গন্ধ অত্যন্ত তীব্র।

ট্রাকের গতি দ্রুত বাড়ছে, ট্রেইলরের পাদানি থেকে লাফ দিল রানা, ঝোঁকটা সামলাবার জন্যে কয়েক গজ দৌড়াল, তারপর ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া টেইললাইটের দিকে তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টে।

ওর খুঁতখুঁতে মন বলছে, গোটা ব্যাপারটার মধ্যে পচা মাছের মতই দুর্গন্ধময় কি যেন একটা আছে। কিন্তু কি করতে পারে ও? ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে চেষ্টা করল। ওর আসল টার্গেট হলো রিফ্রিজারেটর ট্রাক আর মার্সিডিজ। দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে ওগুলো। আর ম্যাক ট্রাক ও ট্রেইলর নিয়ে শিখ লোকটা যাচ্ছে উল্টোদিকে। দুটো কনভয়ের মধ্যে যদি কোন সম্পর্ক প্রমাণ করতে পারেও, একই সঙ্গে দুটোকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। প্রমাণই বা কই?

'চাখার সিং,' নামটা মুখস্থ করে নিচ্ছে রানা, নাম আর বক্স নম্বর। তারপর ছুটে ফিরে এল ল্যাণ্ডক্রুজারের কাছে।

'কে লোকটা? কি বলল তোমাকে?' জানতে চাইল পল।

'বলল, ঘণ্টাখানেক আগে রিফ্রিজারেটর ট্রাকগুলোকে দক্ষিণ দিকে যেতে দেখেছে। ওগুলোর পিছু নিচ্ছি আমরা।' ড্রাইভিং সীটে বসে ফুলস্পীডে

ল্যাণ্ডক্রুজার ছোটাল রানা।

পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল হাইওয়ে, উঁচু মধ্য মালভূমিতে পৌঁছুবে। ধীরে ধীরে কমে গেল ল্যাণ্ডক্রুজারের গতি, তবু ঘণ্টায় সত্তর মাইল ছুটছে। প্রায় কোন কথাই বলছে না পল, ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের ম্লান আলোয় তাকে খুব গম্ভীর ও নার্ভাস দেখাচ্ছে। বারবার আড়চোখে রানার দিকে তাকাচ্ছে, যেন প্রতিবাদ করতে গিয়ে সামলে নিচ্ছে নিজেকে।

একের পর এক কয়েকটা বাঁক পড়ল সামনে। শেষ বাঁকটা ঘোরার পর, অকস্মাৎ, দেখা গেল রাস্তাটা আগলে রেখেছে সাদা একটা রিফ্রিজারেটর ট্রাক। ল্যাণ্ডক্রুজারের তুলনায় অনেক মন্থরবেগে ছুটছে ওটা, এগজস্ট থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। হাইওয়ের মাঝখানটা দখলে রেখেছে ড্রাইভার, পাশ কাটাবার জন্যে রানাকে কোন জায়গা দিচ্ছে না।

বারবার হর্ন বাজাল রানা, স্পটলাইটটা ঘন ঘন জ্বালল আর নেভাল। কিন্তু কাজ হলো না তাতে।

'কুত্তার বাচ্চা, জায়গা ছাড়!' দাঁতে দাঁত পিষল রানা, আবার চেপে ধরল হর্নের বোতাম।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, রানা,' আবেদন জানাল পল। 'নিজেকে সামলাও। তুমি পাগলামি শুরু করলে দু'জনেই বিপদে পড়ব...।'

ল্যাণ্ডক্রুজারকে রাস্তার পাশে নামিয়ে আনল রানা, ওভারটেক করার আগে আবার হর্ন বাজাল। ট্রাক ক্যাবের উইং মিররটা এখন দেখতে পাচ্ছে ও। আয়নায় ড্রাইভারের মুখ দেখা গেল।

ড্রাইভার আর কেউ নয়, জামবু। আয়নায় চোখ রেখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে, কিন্তু ওকে সাইড দেয়ার কোন চেষ্টা করছে না। তার চেহারায় ভীতি, হিংস্রতা, অপরাধবোধ, তিক্ততা ইত্যাদি ভাব মিশে রয়েছে। ইচ্ছে করে রাস্তা আটকে রেখেছে সে, যেদিক থেকেই ওভারটেক করার চেষ্টা করছে রানা সেদিকে সরিয়ে আনছে ট্রাক।

'কুত্তাটা জানে টয়োটায় কারা আছে,' খেপে গিয়ে পলকে বলল রানা। 'জানে চিউইউই থেকে ফিরে আসছি আমরা, ওখানে কি ঘটেছে জানি। খুনের জন্যে তাকেও যে আমরা দায়ী ভাবছি, বুঝতে পেরেছে। সেজন্যেই...।'

'থামো তো তুমি, রানা। এ-সব তোমার উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। কেন এরকম আচরণ করছে তার এক ডজন ব্যাখ্যা থাকতে পারে। তোমার এই পাগলামিতে আর আমাকে টেনো না তো, আমি এ-সবের মধ্যে থাকতে চাই না।'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, বন্ধু,' বলল রানা। 'পছন্দ করো আর না-ই করো, এখন তুমি এটার একটা অংশ।'

হঠাৎ দ্রুতবেগে রাস্তার উল্টোদিকে নিয়ে এল রানা ল্যাণ্ডক্রুজারকে। এবার দেরি করে ফেলল জামবু। ল্যাণ্ডক্রুজারের সরাসরি সামনে ট্রাক সরিয়ে আনতে দেরি করে ফেলল সে, এই সুযোগে লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল টয়োটা, ট্রাকের পাশে জায়গা করে নিল। টয়োটার মেঝেতে পা দিয়ে অ্যাকসিলারেটর চেপে ধরেছে রানা, ক্যাব-এর পাশে চলে এল দ্রুত।

শুধু ল্যাণ্ডক্রুজারের একপাশের চাকা হাইওয়েতে রয়েছে, অপর দিকের চাকাগুলো হাইওয়ে ছেড়ে নিচে নেমে গেছে, তীরবেগে ছুঁড়ে দিচ্ছে আলগা নুড়ি পাথর আর কাঁকর-বিপজ্জনক কিনারায় চলে এসেছে চাকাগুলো, কিনারা থেকে খাড়া নেমে গেছে খাদ, নিচে জাম্বেজি উপত্যকা।

'রানা, ইউ ম্যাড বাস্টার্ড!' আর্তনাদ করে উঠল পল। 'তুমি আমাকে খুন করবে!

কংক্রিটের একটা রোড-মার্কারে ধাক্কা খেল ল্যাণ্ডক্রুজার। সংঘর্ষের প্রচণ্ড শব্দ হলো, রোড সাইন উপড়ে ছুটে চলেছে ল্যাণ্ডক্রুজার, কাত হয়ে আছে একদিকে-যে-কোন মুহূর্তে উল্টে যেতে পারে। কিন্তু তবু রানা পিছু হটতে রাজি নয়, মাথার ওপর ঝুলে থাকা প্রকাণ্ড ট্রাকটার পাশে আঠার মত লেগে থাকল, ক্যাবকে ছাড়িয়ে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে আগে বাড়ছে।

উঁচু ক্যাব থেকে কাত হয়ে ল্যাণ্ডক্রুজারের দিকে তাকাল জামবু। তাকে দেখার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, হুইল থেকে একটা হাত তুলে ট্রাক সরিয়ে নিয়ে থামার ইঙ্গিত করল। মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো জামবু। বাম দিকে সরিয়ে নিল ট্রাক, পথ ছেড়ে দিল ল্যাণ্ডক্রুজারকে।

'এই তো বাছাধন, পথে এসেছ,' বলে জামবুর ছেড়ে যাওয়া জায়গায় ঢুকিয়ে দিল রানা টয়োটাকে। নিজেকে ফাঁদে পড়তে দিয়েছে ও, সতর্ক থাকার কথাও মনে নেই।

এখনও দুটো গাড়ি সবেগে পাশাপাশি ছুটছে, আচমকা ড্রাইভিং হুইল বন বন করে উল্টোদিকে ঘোরাল জামবু। রানা কিছু করার আগেই ল্যাণ্ডক্রুজারের গায়ে আছড়ে পড়ল ট্রাকটা, ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষে ঝাঁক ঝাঁক আগুনের ফুলকি ছুটল। প্রকাণ্ড ট্রাকের চাপে হাইওয়ের পাশে ঘাসের ওপর ফিরে এল ল্যাণ্ডক্রুজার।

হুইলটা অসম্ভব ঝাঁকি খাচ্ছে, সেটাকে বাগে আনতে ব্যর্থ হলো রানা। বাম হাতের একটা আঙুলের হাড় যেন সরে গেছে বলে মনে হলো। কনুই পর্যন্ত অবশ হয়ে গেল ব্যথায়। কষে ব্রেক করল ও, গতি হারিয়ে পিছিয়ে পড়ল ল্যাণ্ডক্রুজার, সগর্জনে এগিয়ে গেল রিফ্রিজারেটর ট্রাক, জোড়া লাগা দুটো গাড়ি বিচ্ছিন্ন হলো ধাতব আর্তনাদ তুলে। থামল ল্যাণ্ডক্রুজার, খাদের কিনারা ছাড়িয়ে সামনের একটা চাকা ঝুলছে।

আহত হাতটা ঘন ঘন ঝাড়ল রানা, ব্যথায় পানি বেরিয়ে এসেছে চোখে। ধীরে ধীরে আঙুলটায় সাড়া ফিরে এল, সেই সঙ্গে বাড়তে শুরু করল রাগ আর আক্রোশ। ইতিমধ্যে রিফ্রিজারেটর ট্রাক পাঁচশো গজ এগিয়ে গেছে, প্রতি মুহূর্তে আরও দূরে সরে যাচ্ছে।

ফোর-হুইল ড্রাইভে রয়েছে ল্যাণ্ডক্রুজার, রিভার্স গিয়ার দিয়ে পিছিয়ে আনার চেষ্টা করল রানা। মাত্র তিনটে চাকা মাটি ছুঁয়ে আছে, তবে সহজেই খাদের কিনারা থেকে সরে এল। টয়োটার এক পাশে রঙ উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে চকচকে ইস্পাত।

'বলো,' পলের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল রানা, 'আর কি প্রমাণ চাই

তোমার?' রাগে হাঁপাচ্ছে ও। 'খাদে ফেলে দিয়ে আমাদেরকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। খুনগুলোর জন্যে ওই শালা জামবুও দায়ী।'

হাইওয়ের পরবর্তী বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে রিফ্রিজারেটর ট্রাক, সেটাকে ধাওয়া শুরু করল রানা।

'এখন আবার কি করতে চাইছ তুমি?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল পল।

'জামবু আমাদেরকে সামনে যেতে দেবে না,' বলল রানা। 'ওর ট্রাকে উঠব আমি, টেনে বের করে আনব ওকে।'

'তোমার এই পাগলামির মধ্যে আমি নেই,' নিচু গলায় বিড় বিড় করল পল। 'অপরাধীকে ধরার জন্যে পুলিস আছে, আইন আছে, তাদের ওপর ছেড়ে দাও।'

তার প্রতিবাদে কান না দিয়ে ফুলস্পীডে টয়োটা ছোটাল রানা। পরবর্তী বাঁক ঘুরতে দেখা গেল ট্রাকটা মাত্র কয়েকশো গজ সামনে। মাঝখানের ব্যবধান দ্রুত কমে এল।

ট্রাকটাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল রানা। সংঘর্ষে ল্যাণ্ডক্রুজারের যতটা ক্ষতি হয়েছে ততটা ক্ষতি হয়নি ওটার। রাস্তাটা পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি উঠে আসায় আগের চেয়ে অনেক কম খাড়া, ফলে ট্রাকের গতি বেড়েছে। পিছনের জোড়া দরজা কার্গো হোল্ডে ঢোকার জন্যে, খাড়া বার-এর সাহায্যে তালা মারা রয়েছে। দরজার চার ধারের কিনারায় এয়ার-টাইট সীল কালো রাবার। এক পাশ থেকে সমতল ছাদে উঠে গেছে ইস্পাতের মই–ওখানে কুলিং ফ্যান আর রিফ্রিজারেটিং ইকুইপমেন্ট রাখা হয়েছে ফাইবার গ্লাস পড-এ।

'আমি ওই মই বেয়ে উঠব,' পলকে বলল রানা। 'আমি বেরিয়ে গেলেই ড্রাইভিং সীটে চলে আসবে তুমি, হুইলটা ধরবে।'

'আমাকে মাফ করতে হবে, ভাই। তোমাকে আগেই বলেছি, এর মধ্যে আমি নেই।'

'বেশ।' রানা এমনকি তার দিকে তাকালও না। 'ধরো না হুইল। যাও, অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে দু'জনেই চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে মরো–দু'জনেই মানে, তুমি আর আমার প্রিয়তমা ল্যাণ্ডক্রুজার, আমি নই। যদি ভেবে থাকো, তোমার মত একটা হাঁদারাম দুনিয়াতে না থাকলে কি আসে যায়, তাহলে কার কি করার আছে।'

দুটো ট্রাক ক্রমশ কাছে চলে আসছে, দুটোর দূরত্ব আর গতি হিসেব করছে রানা। ওর দিকের দরজাটা খুলল। এক হাত হুইলে, খোলা দরজা দিয়ে বাইরে কাত হলো ও। 'তোমার হাতে ছেড়ে যাচ্ছি ওকে, দেখেশুনে রেখো,' চিৎকার করল রানা। হাতের ব্যথার কথা মনে নেই, হুইল ছেড়ে দিয়ে টয়োটার বাইরে সিধে হলো, আঁচড়াআঁচড়ি করে উঠে পড়ল ছাদে। সেই মুহূর্তে ল্যাণ্ডক্রুজারকে বাধা দেয়ার জন্যে ট্রাকটাকে সরিয়ে আনছে জামবু।

দুটো গাড়ি কাছাকাছি হচ্ছে, লাফ দিয়ে মাঝখানের সরু ফাঁকটা পেরিয়ে এল রানা, খপ করে ধরে ফেলল মইয়ের একটা ধাপ, দুই গাড়ির ইস্পাত আবার ঘষা খেতে যাচ্ছে দেখে শরীরের নিচের অংশ ওগুলোর মাঝখান থেকে ওপরে তুলে নিল।

ল্যাণ্ডক্রুজারের ড্রাইভিং হুইলে এক পলকের জন্যে পলকে দেখতে পেল রানা। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ দুটো, ঘামে চকচক করছে মুখ। ক্লান্ত হয়ে পিছিয়ে পড়ল টয়োটা, ট্রাকের পিছনে চলে গেল। আতঙ্কিত হলেও, খুব সাবধানে চালাচ্ছে পল। এতই সাবধানে, রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে [illegible]

মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে রানা। পৌঁছে গেল সমতল ছাদে। ছাদের মাঝখানে ফ্যান হাউজিং, পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে নিচু রেইলিং। হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোল রানা। ট্রাক বাঁক ঘোরার সময় রেইলিং ধরে চুপচাপ পড়ে থাকল, তারপরও মনে হলো রেইল থেকে খসে যাবে হাত, ছিটকে পড়ে যাবে নিচে।

ক্যাবের মাথায় আসতে পুরো পাঁচ মিনিট লাগল। প্রায় নিশ্চিতভাবে জানে রানা, জামবু তাকে ওপরে উঠতে দেখেনি। কার্গো হোল্ড-এর মোটাসোটা শরীর পিছন দিকটা দেখার জন্যে একটা বাধা। ইতিমধ্যে ধরে নিয়েছে সে, হতাশ ল্যাণ্ডক্রুজারের ড্রাইভার হাল ছেড়ে দিয়েছে, কারণ ট্রাকের পিছনে খালি রাস্তায় ওটার হেডলাইটের আলো দেখা যাচ্ছে না।

হামাগুড়ি দিয়ে কিনারায় সরে এল রানা, উঁকি দিল যে দিকটায় প্যাসেঞ্জার বসে। দরজার নিচে একটা রানিং বোর্ড রয়েছে, আর ক্যাব-এর পাশ থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা উইং মিরর হাতল হিসেবে কাজ দেবে। এখন শুধু জানতে বাকি থাকল এদিকের দরজায় জামবু তালা দিয়েছে কিনা। তালা লাগানোর কোন কারণ নেই, নিজেকে উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করল-রানা। ট্রাকের হেডলাইট আলোর এক জোড়া টানেল তৈরি করেছে সামনের রাস্তায়, সেদিকে তাকাল ও।

রাস্তাটা বাম দিকে বাঁকা হতে শুরু না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। টানটা এখন ওকে ক্যাব-এর গায়ের সঙ্গে সাঁটিয়ে রাখবে, ছুঁড়ে বাইরের দিকে ফেলে দেবে না। কিনারা থেকে হড়কে নামল ও, আঁকড়ে ধরল উইং মিরর। মুহূর্তের জন্যে শূন্যে ঘন ঘন লাথি মারল পা দুটো, তারপর ধাক্কা খেল চওড়া ইস্পাতের রানিং বোর্ড-এ। ভেতর দিকে মুখ করে রয়েছে ও, ঝুলে আছে আয়নার হাতল ধরে, ক্যাব-এর জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে ভেতরে।

চমকিয়ে রানার দিকে তাকাল জামবু, কি যেন বলল চিৎকার করে। দরজার লকিং হ্যাণ্ডেল ধরার জন্যে হাত বাড়াল সে, কিন্তু প্যাসেঞ্জার সীটের পুরোটা দৈর্ঘ্যের অর্ধেকের বেশি নাগাল পেল না। মাতালের মত এদিক ওদিক করছে ট্রাক, আবার হুইল ধরতে বাধ্য হলো সে।

হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ক্যাবের ভেতর লাফ দিল রানা। সীটের অর্ধেকটা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল ওর শরীর। ওর মুখ লক্ষ্য করে ঘুসি মারল জামবু। বাম চোখের নিচে লাগল সেটা। মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে চোখে সর্ষে ফুল দেখল রানা, তারপরই ভ্যাকুম ব্রেক কন্ট্রোল-এর হাতল ধরে পুরোটা টেনে নিল।

ট্রাকের প্রতিটি দৈত্যাকার চাকা একযোগে লক হয়ে গেল। বিস্ফোরিত হলো নীল ধোঁয়া, আর্তনাদ শুরু করল রাবার, হাইওয়ের ওপর হড়কাতে শুরু করেছে

ট্রাক। সীট থেকে সামনের দিকে ছিটকে পড়ল জামবু। স্টিয়ারিং হুইলটা ধাক্কা খেল তার বুকে, উইণ্ডশীল্ডের সঙ্গে কপাল ঠুকে গেল–এত জোরে যে মাকড়সার জাল হয়ে গেল কাচটা। সীটের ওপর নেতিয়ে পড়ল সে, তার দিকে হাত লম্বা করে স্টিয়ারিং হুইলটা ধরে ফেলল রানা। স্থির হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত ট্রাকটাকে সোজা রাখল ও–হাইওয়ে থেকে অর্ধেক বেরিয়ে গেছে, অফসাইডের হুইলগুলো অগভীর নালায় পড়েছে।

ইগনিশন-এর সুইচ অফ করে আবার জামবুর ওপর দিয়ে হাত বাড়াল রানা, ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলে ফেলল। জামবুর কাঁধ খামচে ধরে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল, ফেলে দিল ক্যাব থেকে। ছ'ফুট ওপর থেকে মাটিতে পড়ল সে, তারপর ধীরে ধীরে হাঁটুর ওপর সিধে হলো। পাকা আপেলের রঙ ও আকার নিয়ে ফুলে উঠেছে তার কপাল।

লাফ দিয়ে নিচে নামল রানা, তার ইউনিফর্ম টিউনিকের কলারটা ধরার জন্যে ঝুঁকল।

'কুত্তার বাচ্চা।' জামবুর গলায় কলারটা ফাঁসের মত পাকিয়ে মোচড়াল ও। 'আলি শাহ আর তার পরিবারকে খুন করেছিস তুই।'

হেডলাইটের আভায় দেখা গেল জামবুর মুখ ফুলে বেগুনি হয়ে উঠছে। 'প্লীজ, মি. রানা, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। এ-সব আপনি কেন করছেন?' কলারটা চেপে বসেছে গলায়, রুদ্ধশ্বাসে চি-চি আওয়াজ করল সে।

'বেজন্মা শুয়োর, ভেবেছিস মিথ্যেকথা বলে পার পাবি...?'

টিউনিকের হেমের নিচে হাত গলাল জামবু। তার বেল্টে একটা স্কিনিং নাইফ রয়েছে, চামড়ার খাপে। স্ট্র্যাপ খোলার আওয়াজ ঢুকল রানার কানে, খাপ থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে ঝিক করে উঠল ফলাটা।

কলার ছেড়ে দিয়ে পিছন দিকে লাফ দিল রানা, ওপর দিকে ছুরি চালিয়েছে জামবু। দ্রুতই চালিয়েছে ছুরিটা, তবে যথেষ্ট দ্রুত নয়, রানার শার্টের আলগা একটা ভাঁজে লাগল ফলা, ক্ষুরের মত চিরে দিল। ছুরির ডগা রানার নিচের পাঁজরের স্পর্শ পায়নি, শুধু চামড়া ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে, রেখে গেছে অগভীর একটা রেখা।

নিজের পায়ে দাঁড়াল জামবু, বাগিয়ে ধরে আছে ছুরিটা। 'আপনাকে আমি খুন করে ফেলব,' সাবধান করল সে, পরিষ্কার করার জন্যে মাথাটা এদিক ওদিক নাড়ছে, ছুরি ধরা হাতটা একদিক থেকে আরেকদিকে ঘোরাচ্ছে, লক্ষ্যস্থির করতে চায় রানার তলপেটে।

'হুস!' লাফ দেয়ার ভঙ্গি করেও লাফ দিচ্ছে না সে, মুখ থেকে এমন সব শব্দ করছে যেন শিয়াল বা কুকুর তাড়াচ্ছে। 'ভাগো, বিদেশী হনুমান! লেজ তোলো, পালাও!' এবার লাফ দিল সে, ছুরি চালাল সবেগে, রানা বাধ্য হলো পিছু হটতে। তারপরই দীর্ঘ মেয়াদী হামলায় নাচতে নাচতে এগোল জামবু, প্রতি মুহূর্তে পোচ মারার ভঙ্গিতে বাতাস কাটছে ফলাটা। তার সঙ্গে হোঁচট খেতে ও নাচতে বাধ্য করছে রানাকে।

হঠাৎ আক্রমণের ধরনটা বদলে ফেলল জামবু। নিচের দিকে কোপ মারল

সে. উরু জখম করে রানাকে অচল করে দিতে চায়—তবে ছুরিটা সারাক্ষণ নিরাপদ সযত্নে রাখল, রানা যাতে তার কব্জি ধরতে না পারে। পিছু হটার সময় হোঁচট খাওয়ার ভান করল রানা। একটা হাঁটু ভাঁজ হয়ে মাটিতে ঠেকল, ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় একটা হাতও রাখল মাটিতে।

[illegible] জামবু, এটাকেই তার সুবর্ণ সুযোগ মনে করে কাজটা শেষ করার জন্যে লাফ দিল সামনে। রানার ভাঁজটা বদলায়নি, নড়ে উঠল শুধু মাটিতে রাখা হাতটা। ছুরি নিয়ে যারা লড়ে, এটা তাদের একটা কৌশল। জামবুর চোখে এক মুঠো ধুলো ছুঁড়ে দিয়েছে ও।

লাফ দিয়ে শূন্যে রয়েছে জামবু, হাত দিয়ে চোখ ঢাকল। ঝট করে এক পাশে সরে গিয়ে তার ছুরি ধরা হাতের কব্জিটা খপ করে ধরে ফেলল রানা, কঠিন মোচড় দিয়ে ছুরির ডগা তুলে দিল ওপর দিকে।

দুটো বুক এক হয়ে আছে এই মুহূর্তে, ছুরিটা মাথার ওপর সবটুকু লম্বা করা ওদের হাতে। মুখটা ঝট করে সামনে বাড়াল রানা, হাতুড়ির মত। ওর শক্ত কপাল থেঁতলে দিল জামবুর নাক। হাঁপিয়ে উঠল জামবু, হেলান দিল পিছন দিকে। রানার ভাঁজ করা হাঁটু সবেগে গুঁতো দিল তার উরুসন্ধিতে—ওখানে নরম যা কিছু আছে সব প্রায় ভর্তা হয়ে যাবার কথা। এবার আর্তনাদ করে উঠল জামবু, তার ডান হাত শক্তি হারিয়ে ফেলল।

হ্যাঁচকা টানে সেটাকে নিচে নামাল রানা, ছুরি ধরা মুঠো ট্রাকের কঠিন ইস্পাতে আছড়াল। জামবুর অসাড় আঙুল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল ছুরিটা। তার গোড়ালির পিছনটায় হুকের মত একটা পা আটকাল রানা, তারপর ধাক্কা দিল বুকে। হাত-পা ছড়িয়ে হাইওয়ের পাশে গর্তের মধ্যে পড়ে গেল সে।

জামবু নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁড়াবার আগেই ছোঁ দিয়ে ছুরিটা তুলে নিল রানা, এগিয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে। ফলার ডগাটা তার চিবুকের তলায় ঠেকাল ও, রুপালি ফলায় রক্তের ছোট্ট একটা ফোঁটা দেখা গেল, উজ্জ্বল একটা রুবি পাথর যেন।

'নোড়ো না,' দাঁতে দাঁত পিষল রানা। 'নড়লেই কতল হয়ে যাবে।' স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে কয়েক সেকেণ্ড সময় নিল ও। 'ঠিক আছে, এবার সিধে হও—ধীরে ধীরে।'

পাঁচ

ধীরে ধীরে সিধে হলো জামবু, আহত উরুসন্ধি দু'হাতে চেপে ধরে আছে। পিছু হটে ট্রাকের গায়ে পিঠ ঠেকাতে বাধ্য করল রানা তাকে, গলায় এখনও লেগে রয়েছে ছুরির ফলা।

'ট্রাকে আইভরি আছে,' বলল রানা। 'চলো, দেখাও আমাকে।'

'না।' ফিসফিস করল জামবু। 'নেই। আপনি কি চান আমি জানি না। আপনি

পাগল হয়ে গেছেন।'

'হোল্ডের চাবি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা না ঘুরিয়ে চোখ ঘোরাল জামবু। 'আমার পকেটে।'

'ঘুরে দাঁড়াও, ধীরে ধীরে,' নির্দেশ দিল রানা। 'ট্রাকের দিকে মুখ করো।'

নির্দেশ পালন করল জামবু, পরমুহূর্তে তার মাথায় প্রচণ্ড ধাক্কা দিল রানা। ইস্পাতের গায়ে ফুলে থাকা কপালটা থেঁতলে গেল। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল জামবু।

'আবার ওরকম করার একটা অজুহাত দরকার আমার,' তার কানে কানে ফিসফিস করল রানা। 'শুয়োরের মত চি-চি আওয়াজ আমার কানে মধু ঢালছে।'

তার কিডনির লেভেলে ছুরির ফলা ঠেকাল রানা, শুধু কাপড় ভেদ করল ডগাটা, চামড়া নয়।

'এবার চাবি বের করো,' নির্দেশ দিল ও।

পকেটে হাত ঢোকাল জামবু। বের করার সময় মৃদু আওয়াজ করল চাবিগুলো।

'হাঁটো, ধীরে ধীরে,' বলল রানা, জামবুকে সামনে নিয়ে ট্রাকের পিছনে চলে এল। 'তালা খোলো।'

কী হোলে চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাল জামবু।

'বেশ। এবার তোমার বেল্ট থেকে হাতকড়া দুটো বের করো,' বলল রানা। অ্যান্টি-পোচিং ডিউটি দেয়ার সময় সব রেঞ্জারদের কাছেই থাকে ওগুলো।

হাতকড়া বের করল জামবু।

'একটা তোমার হাতে পরো,' নির্দেশ দিল রানা। 'তারপর চাবিটা দাও আমাকে।'

একটা হ্যাণ্ডকাফ কব্জি থেকে ঝুলছে, কাঁধের ওপর দিয়ে চাবিটা বাড়িয়ে দিল জামবু। চাবির গোছাটা পকেটে ভরল রানা, তারপর হ্যাণ্ডকাফের দ্বিতীয় লিঙ্কটা ট্রাকের স্টীল ব্রেসিং-এর সঙ্গে আটকে দিল।

পিছনের জোড়া দরজার লকিং হাতল ঘোরাল রানা। দরজা খুলতেই রিফ্রিজারেটরের ভেতর দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বেরিয়ে এল, নাকে ধাক্কা মারল মাংসের গন্ধ। হোল্ডের ভেতরটা অন্ধকার, লাফ দিয়ে টেইলগেইটে উঠে পড়ল ও, সুইচের খোঁজে হাতড়াচ্ছে। সুইচ অন করতেই ঠাণ্ডা নীল আভায় ভরে গেল হোল্ডের ভেতরটা। ছাদের কাছাকাছি রেইল থেকে সারি সারি হুকের সঙ্গে ঝুলছে মার্বেল পাথরের মত সাদা চর্বিঅলা হাতির মাংস। টন টন মাংস, এমন গায়ে গায়ে লেগে আছে যে রানা শুধু প্রথম সারির ধড়গুলো দেখতে পেল। হাঁটু গাড়ল, ওগুলোর নিচে সরু প্যাসেজের ভেতরটা দেখতে চায়। ইস্পাতের মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে, তাছাড়া দেখার কিছু নেই।

হতাশায় ছেয়ে গেল রানার মন। ঝুলন্ত ধড়গুলোর নিচে আইভরির স্তূপ দেখতে পাবে বলে আশা করেছিল ও। মাথা নিচু করে সামনে এগোল, কমপার্টমেন্টের আরও খানিক ভেতরে ঢুকতে চায়। কিছুটা এগোতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দম আটকে এল ওর। কাঁচা মাংস শক্ত পাথর হয়ে গেছে, ওগুলোর ধাক্কা খেয়ে

হয়ে গেল। বহুকষ্টে এগোচ্ছে তবু, জেদ চেপেছে, জানবে কোথায় লুকিয়েছে আইভরি।

দশ মিনিট পর হাল ছেড়ে দিল রানা। হোল্ডের ভেতর কোন আইভরি নেই। লাশ নিয়ে ট্রাক থেকে নিচে নামল ও। কাঁচা মাংসের সংস্পর্শে কাপড়ে দাগ লেগেছে। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল ট্রাক চেসিসের নিচে, গোপন কমপার্টমেন্ট আছে কিনা দেখছে।

আবার হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখল, ওর দিকে তাকিয়ে আছে জামবু, চোখে নীরব উল্লাস। 'আপনাকে বললাম না? আইভরি নেই। আপনি সরকারী ট্রাক ভেঙেছেন। আমাকে জখম করেছেন। আপনার জন্যে নানারকম বিপদ অপেক্ষা করছে, বিদেশী বাবু। জানেন তো না, বিদেশীদের জন্যে আমাদের আইন খুব কড়া।'

'তোমাকে শাস্তি দেয়ার কাজটা এখনও শেষ করিনি আমি,' ঠাণ্ডা, কঠিন সুরে বলল রানা। 'তুমি একটা মিষ্টি গান না ধরা পর্যন্ত শাস্তিটা চলতেই থাকবে–গানের কথাগুলোয় থাকবে তুমি আর চীনা ভদ্রলোক আইভরি নিয়ে কি করেছ।'

'আইভরি নেই,' আবার বলল জামবু। তার কাঁধ দুটো শক্ত করে ধরে ঘোরাল রানা, ট্রাকের দিকে মুখ করাল তাকে।

ট্রাকের রড থেকে হ্যাণ্ডকাফের লিঙ্ক খুলে নিল ও, জামবুর দুটো কব্জিই তুলে আনল তার পিঠের ওপর দিকে, তারপর এক করে আটকাল। 'চলো এবার,' হিসহিস করে বলল ও। 'আলোয় চলো, তোমার ওপর কাজ শুরু করব।'

ব্যথায় কাতরাচ্ছে জামবু, রানা তাকে ট্রাকের সামনে নিয়ে এল। জোড়া হেডলাইটের মাঝখানে, সামনের ফেণ্ডারের সঙ্গে হাতকড়া পরাল তাকে। হাত দুটো এখনও তার পিছনে। সম্পূর্ণ অসহায় সে।

'আলি শাহ আমার বন্ধু ছিল,' নরম গলায় বলল রানা। 'তুমি তার স্ত্রী ও নাবালিকা দুটো মেয়েকে রেপ করেছ। তুমি আছাড় মেরে তার ছেলের খুলি ফাটিয়েছ। গুলি করেছ আলিকে···।'

'না, আমি নই! আমি কিছুই জানি না!' চিৎকার করছে জামবু। 'আমি কাউকে খুন করিনি! আইভরি নিইনি, খুন করিনি···!'

শান্ত গলায় বলে চলেছে রানা, যেন জামবু ওকে বাধা দেয়নি। 'কাজটা করে আমি মজা পাচ্ছি, এটা বিশ্বাস করলে নিজের উপকার করবে। যতবার চিৎকার করবে, আলির কথা মনে পড়বে আমার, সন্তুষ্টবোধ করব আমি।'

'কিছুই আমি জানি না···আপনি পাগল···!'

জামবুর বেল্টের ভেতর ছুরি ঢুকিয়ে চামড়াটা কেটে ফেলল রানা। কোমরে ঢিলে হয়ে পড়ল খাকি ইউনিফর্ম। টান দিয়ে ওয়েস্টব্যাণ্ড খুলল রানা, ট্রাউজারের ওপর দিকে ঠেলে দিল ফলাটা। 'ক'টা যেন বউ তোমার, জামবু? চার? পাঁচ? ক'টা?' ওয়েস্টব্যাণ্ডটা কেটে ফেলল ও, কোমর থেকে খসে পড়ল ট্রাউজার। 'আমার ধারণা, তোমার স্ত্রীরা চাইছে তুমি আমাকে আইভরি সম্পর্কে সব কথা বলে দাও। তারা চাইছে তুমি আমাকে আলি শাহ সম্পর্কে সব বলবে, বলবে কিভাবে সে মারা গেল।'

ঠকঠক করে কাঁপছে জামবু, রানার সন্দেহ হলো ভয় পাবার মিথ্যে ভান করছে সে। তার আণ্ডারপ্যান্ট হাঁটুর কাছে নামিয়ে আনল ও। 'দেখা যাক কি ধন-সম্পদ আছে তোমার।' হিংস্র, ঠাণ্ডা হাসি ওর ঠোঁটে। 'আমার ধারণা, তোমার স্ত্রীরা অত্যন্ত অসুখী হতে যাচ্ছে, জামবু।'

হ্যাঁচকা টান দিয়ে জামবুর টিউনিক খুলে ফেলল, ছেঁড়া বোতামগুলো হেডলাইটের পিছনে অন্ধকারে উড়ে গেল। টিউনিক খুলে নেয়ায় হাঁটু থেকে গলা পর্যন্ত নগ্ন হয়ে পড়ল জামবু। কালো চুলের গোল আকৃতির বন তার বুক ও পেট ঢেকে রেখেছে। নাভির নিচেও ঘন জঙ্গল। 'আইভরি আর গণ্ডের গানটা শোনাও আমাকে, জামবু,' বলল রানা, নাভির নিচে তাক করল ছুরির ফলা।

হাঁপিয়ে উঠল জামবু, চামড়ার ফলার ঠাণ্ডা স্পর্শ পেয়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল।

'মুখ খোলো, জামবু। তা না হলে তোমার ওটা সত্যি আমি কেটে নেব।'

'আপনি পাগল হয়ে গেছেন!' ফোঁপাচ্ছে জামবু। 'আমি জানি না কি চান আপনি।'

'আমি চাই তোমার এটা গোড়া থেকে কেটে ফেলি।'

'আলি শাহকে আমি খুন করিনি!' গলা ভেঙে গেছে জামবুর। 'আল্লাহর কিরে, আমি না!'

'আর তার স্ত্রী ও বাচ্চাগুলোকে, জামবু? তোমার এই কুৎসিত রড ওদের ওপর কাজে লাগাওনি?' ছুরির ফলা দিয়ে খোঁচা দিল রানা।

'না! না! আমি নই! সত্যি…থামুন, বলছি…ঠিক আছে, বলছি সব–ছুরিটা ওখান থেকে সরান!'

'গুড!' উৎসাহ দিল রানা। 'প্রথমে তুমি আমাকে চাখার সিং সম্পর্কে বলো…,' অন্ধকারে একটা ঢিল ছুঁড়ল ও, লেগে গেল।

'বলব, তার কথা বলব আপনাকে…আমার ওপর দয়া করুন, ওটা কাটবেন না…প্লীজ…প্লীজ…।'

'রানা,' অন্য একটা কণ্ঠস্বর চমকে দিল রানাকে। ল্যাণ্ডক্রুজারের কোন শব্দই পায়নি ও। নিশ্চয়ই ট্রাকের হোল্ডে তল্লাশি চালাবার সময় এসেছে। এই মুহূর্তে হেডলাইটের পাশে ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পল নিউম্যান।

'লোকটাকে ছেড়ে দাও, রানা,' তার কণ্ঠস্বর কঠিন ও কর্কশ। 'ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এসো,' নির্দেশ দিল সে।

'তুমি এর মধ্যে নাক গলিয়ো না তো,' ধমক দিল রানা।

কিন্তু আরও কাছে সরে এল পল, তার হাতে একটা এ/কে ফরটিসেভেন দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ল রানা। তার অস্ত্র ধরার ভঙ্গিটায় বিস্ময়কর কর্তৃত্ব ও দক্ষতা প্রকাশ পাচ্ছে।

'মানে?'

'ছেড়ে দাও ওকে,' আরও কঠিন হলো পলের গলা। 'অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করছ তুমি।'

'লোকটা ক্রিমিন্যাল, খুন করেছে,' প্রতিবাদ করল রানা, কিন্তু রাইফেলটা ওর

তলপেটে তাক করে ট্রিগারে চাপ বাড়াল পল, কাজেই খানিকটা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো ও।

'তোমার হাতে কোন প্রমাণ নেই। ট্রাকে তুমি আইভরি পাওনি,' বলল পল।

'অপরাধ স্বীকার করতে যাচ্ছিল ও,' রাগে গরম ও লালচে হয়ে উঠল রানার মুখ। 'তুমি নাক না গলালে...।'

'তুমি ওর ওপর নির্যাতন করছিলে,' পলও রাগে চেঁচাচ্ছে। 'তুমি একটা অসভ্য, রানা। আমার ধারণা ছিল না কেউ কারও ওপর এরকম জঘন্য নির্যাতন চালাতে পারে। এরকম অত্যাচার চালালে ওকে দিয়ে স্বীকার করানো যাবে দুনিয়ার সমস্ত পাপ ওর দ্বারাই হয়েছে। তুমি ভুলে গেছ, ওরও অধিকার আছে। ওর অধিকার তুমি কেড়ে নিতে পারো না। হাতকড়া খুলে দাও, যেতে দাও ওকে।'

'দয়ার সাগর, কোমল হৃদয়,' ফুঁসছে রানা। 'কিন্তু কার ওপর দয়া দেখাচ্ছ? ও তো একটা হিংস্র জানোয়ার!'

'ও একটা মানুষ,' নিজের যুক্তিতে অটল পল। 'ওর ওপর নির্যাতন হচ্ছে দেখলে আমাকে বাধা দিতে হবে, তা না হলে আমি তোমার মত অপরাধী হব। দশ বছর জেলে পচার কোন ইচ্ছে আমার নেই। যেতে দাও ওকে।'

'প্রথমে সব কথা স্বীকার করুক ও!' এক পা এগিয়ে আবার জামবুর তলপেটের নিচে ছুরি ঠেকাল রানা।

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল জামবুর গলা চিরে।

রাইফেল তুলে গুলি করল পল।

গুলিটা রানার মাথার এক ফুট ওপর দিয়ে ছুটে গেল। মাজল ব্লাস্ট রানার ঘামে ভেজা চুল এলোমেলো করে দিল, ধাক্কা খেয়ে পেছন দিকে হেলান দিল ও, হাত দুটো উঠে চেপে ধরেছে কান।

'ওটা ওয়ার্নিং ছিল, রানা।' থমথম করছে পলের চেহারা। 'ভেবো না আমি শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছি। দাও, হাতকড়ার চাবি দাও আমাকে।'

বিস্ফোরণের ধাক্কায় আচ্ছন্নবোধ করছে রানা, আবার গুলি করল পল। রানার জোড়া বুটের মাঝখানের মাটিতে গর্ত তৈরি করল বুলেটটা।

'আমি সিরিয়াস, রানা। কসম খেয়ে বলছি। তোমার সঙ্গে বিপদে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে বরং তোমাকে আমি খুন করব।'

'অলিকে দেখেছ তুমি...,' মাথাটা ঝাঁকাচ্ছে রানা, ঝাঁ ঝাঁ করছে কান দুটো।

'আমি আরও দেখেছি এই লোকটাকে তুমি পুরুষত্বহীন করার হুমকি দিচ্ছিলে। ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে। ভালোয় ভালোয় চাবিটা আমাকে দাও, তা না হলে পরের গুলিটা তোমার একটা হাঁটু গুঁড়িয়ে দেবে।'

পলের চোখ দেখে বোঝা গেল, সত্যি তাই করবে সে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাবিটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল রানা।

'ঠিক আছে, এবার তুমি পিছিয়ে এসো,' নির্দেশ দিল পল। রানার দিকে রাইফেল ধরে রেখে জামবুর একটা কব্জি থেকে হাতকড়া খুলল সে, তারপর চাবিটা তার হাতে ধরিয়ে দিল।

'ইউ ব্লাডি ইডিয়ট!' অসহায় রাগে এখনও ফুঁসছে রানা। 'কি ক্ষতি করলে নিজেও জানো না। আর এক মিনিট সময় পেলে সব কথা জানা যেত। জানা যেত আলিকে কে মেরেছে, আইভরিগুলো কোথায়...।'

বাকি কব্জিটা মুক্ত করল জামবু, দ্রুত কোমরে ট্রাউজার আটকাল, গায়ে জড়াল টিউনিক। সে তার সাহস ফিরে পেয়েছে। 'প্রলাপ বকছেন উনি!' জোর গলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করল। 'কিছুই আমি স্বীকার যাইনি। কেন স্বীকার যাব, কি স্বীকার যাব? আলি শাহ সম্পর্কে আমি কিছু জানলে তো! আমরা চিউইউই ছাড়ার সময় ওয়ার্ডেন বেঁচে ছিলেন...।'

'ঠিক আছে। এ-সব তুমি পুলিসকে বলতে পারবে,' জামবুকে থামিয়ে দিল পল। 'ট্রাকে করে আমি তোমাকে হারারে নিয়ে যাচ্ছি। যাও, ল্যাণ্ডক্রুজার থেকে আমার ক্যামেরা আর ব্যাগটা নিয়ে এসো। সামনের সীটে পাবে।'

পার্ক করা ল্যাণ্ডক্রুজারের দিকে হন হন করে এগোল জামবু।

'শোনো, পল। মাত্র পাঁচটা মিনিট সময় দাও আমাকে তুমি,' আবেদন জানাল রানা।

ওর দিকে রাইফেল নাড়ল পল। 'তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ, রানা। হারারে পৌঁছে আমার প্রথম কাজ হবে পুলিসকে সব কথা জানানো।'

ফিরে এলো জামবু, কাঁধে সনি ভিডিও ক্যামেরা, হাতে ক্যানভাস ব্যাগ। 'হ্যাঁ, পুলিসকে আপনি বলবেন, এই উন্মাদ ভদ্রলোক আমার লাঠি আর ডিম কেটে নিচ্ছিল,' চিৎকার করছে সে। 'বলবেন, আইভরি পাওয়া যায়নি...।'

'যাও, ট্রাকে ওঠো,' তাকে নির্দেশ দিল পল। 'স্টার্ট দাও।' জামবু নির্দেশ পালন করার পর রানার দিকে ফিরল সে। 'আমি দুঃখিত, রানা। তুমি একা হয়ে গেলে। আমি আর তোমার কোন সাহায্যে আসব না। ওরা চাইলে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষি দেব আমি। নিজেকে আমার কাভার দিতে হবে, রানা।'

'এমন কাপুরুষ আর স্বার্থপর লোক জীবনে আমি দেখিনি,' তিক্তকণ্ঠে বলল রানা। 'কিন্তু, তুমিই না সুবিচার আর ন্যায়নীতি সম্পর্কে প্রায়ই ভাষণ দিতে? আলি আর রুমানার ব্যাপারটা তোমাকে স্পর্শ করল না?'

'তুমি যা করছিলে তার সঙ্গে সুবিচারের কোন সম্পর্ক নেই,' ট্রাকের ডিজেল এঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল পলের গলা। 'তুমি একাধারে পুলিস, বিচারক ও জল্লাদের ভূমিকা নিয়ে ফেলেছিলে, রানা। একে সুবিচার বলে না, বলে উন্মত্ততা বা স্বেচ্ছাচার। আমি কেন এ-ধরনের একটা অন্যায়ের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে যাব! তুমি আমার ঠিকানা জানো, ইচ্ছে হলে আমার পাওনা টাকা ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারো। বিদায়, রানা। সম্পর্কটা এভাবে শেষ হওয়ায় সত্যি আমি দুঃখিত।'

ক্যাবে উঠে প্যাসেঞ্জার সীটে বসল সে। 'সাবধান, আমাদের থামাবার চেষ্টা করো না,' বলে হাতের রাইফেলটা রানাকে দেখাল সে। 'এটা কিভাবে চালাতে হয় আমি জানি।'

দরজা বন্ধ করে দিল পল, ট্রাক নিয়ে হাইওয়েতে উঠে পড়ল জামবু।

অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে থাকল রানা, লাল টেইললাইটের দিকে তাকিয়ে

থাকল, যতক্ষণ না ওটা পরবর্তী বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হলো। বিস্ফোরণের ধাক্কা খেয়ে এখনও কানের ভেতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে ওর। সেই সঙ্গে আচ্ছন্নবোধ করছে, বমির একটা ভাবও আছে। পার্ক করা ল্যান্ডক্রুজারের দিকে এগোল ও, পা ফেলছে এলোমেলো।

ড্রাইভিং সীটে এসে বসল। প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা এখনও অস্থির করে তুলছে ওকে। রাগ হচ্ছে গণ্ড আর তার সহকারীদের ওপর, জামবুর কথা মনে পড়লেই আক্রোশে দাঁত পিষছে। সবচেয়ে বেশি রাগ ওর পলের ওপর। তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হলো ও, দূর হয়ে গেল রাগ। সত্যি যে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, উপলব্ধি করতে পারল। আচরণটাকে উন্মত্ততাই বলতে হয়। এমন সব অভিযোগ তুলছে সে যেগুলো প্রমাণ করতে পারবে না। সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি করেছে ও। সরকারী কর্মচারীর ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, গুরুতরভাবে আহত না করলেও। তারা ওর বিরুদ্ধে অন্তত গোটা পাঁচেক অভিযোগ আনতে পারবে।

তারপর আবার যখন আলি আর তার পরিবারের কথা ভাবল রানা, নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কোন গুরুত্ব থাকল না। গোটা ষড়যন্ত্র উন্মোচিত হতে যাচ্ছিল, ভাবতেই তিক্ততায় ভরে গেল মন। জামবুকে আর পাঁচ মিনিট কথা বলাতে পারলে সব ক'টা অপরাধীর নাম জানা যেত। দুঃখিত, আলি। প্রথমবার ব্যর্থ হয়েছি আমি।

এরপর কি করা উচিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মাথাটা ব্যথা করছে, সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করতে পারছে না। জামবুকে ধাওয়া করে কোন লাভ নেই। পল একটা বাধা, সে-ও সতর্ক হয়ে গেছে। তাছাড়া, যেভাবেই হোক, আইভরিগুলো অন্য কোথায় সরিয়ে ফেলেছে ওরা।

আর কি করার আছে ওর? অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ড, হ্যাঁ। মূল ষড়যন্ত্রের তিনিই হোতা। তবে আইভরি গায়েব হয়ে যাবার পর তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে শুধু থাকছে আলির রেখে যাওয়া দুর্বোধ্য মেসেজ আর অকুস্থলে তাঁর জুতোর ছাপ।

আর চাখার সিং। জামবু স্বীকার করেছে, চাখার সিংকে চেনে সে।

আর আছে পোচারদের একটা দল। জাম্বেজি নদীতে তাদেরকে আব্বাস উলুম্বু বাধা দিতে পেরেছে কিনা কে জানে। আব্বাস ওদের ক'জনকে আটক করতে পারলে কাজ হয়। সে অন্তত পলের মত নরম নয়। তাছাড়া, আব্বাসেরও বন্ধু ছিল আলি। বন্দী পোচারদের কাছ থেকে কিভাবে তথ্য বের করতে হয় জানা আছে তার।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, চিরুণ্ডু পুলিস পোস্ট থেকে মানা পুল-এ ফোন করবে। স্টার্ট দিয়ে ল্যান্ডক্রুজার ছেড়ে দিল ও। চিরুণ্ডু ব্রিজ পুলিস স্টেশন কারেবাই-এর চেয়ে কাছে। পুলিসের কাছে রিপোর্ট করবে ও, লক্ষ রাখবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তদন্ত শুরু হয়। আলির মেসেজ আর জুতোর দাগ সম্পর্কে পুলিসকে জানানো দরকার।

মাথার ব্যথাটা অসম্ভব বেড়ে গেল। রাস্তার পাশে টয়োটা থামিয়ে ফার্স্ট-এইড কিট থেকে দুটো পেইন কিলার ট্যাবলেট বের করল, ভাকুম ফ্লাস্ক থেকে এক মগ

কফি ঢেলে গিলে ফেলল। ল্যাণ্ডক্রুজার ছুটে চলল আবার, একটু পরই কমতে শুরু করল মাথার ব্যথা।

ভোর চারটের দিকে চিরুণ্ডু ব্রিজে পৌঁছুল রানা। পুলিস স্টেশনে একজন মাত্র করপোরালকে পাওয়া গেল, ডেস্কে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ডাকাডাকিতে কাজ হলো না, রীতিমত ধাক্কা দিয়ে তার ঘুম ভাঙাতে হলো। টকটকে লাল চোখ মেলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

'আমি একটা খুন সম্পর্কে রিপোর্ট করতে চাই, অনেকগুলো খুন সম্পর্কে।'

রানাকে বিস্মিত করে দিয়ে করপোরাল জানাল, হত্যাকাণ্ডের রিপোর্ট কিভাবে লিখতে হয় জানা নেই তার। থানার পিছনে স্টাফ কোয়ার্টার, সেখান থেকে সার্জেন্টকে ডেকে আনতে বলল রানা। প্রায় আধ ঘণ্টা পর এলো সার্জেন্ট, তার চোখও লাল হয়ে আছে, তবে পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরে এসেছে।

'হারারের সিআইডি হেডকোয়ার্টারে ফোন করুন,' তাগাদা দিল রানা। 'চিউইউইয়ে একটা ইউনিট পাঠাতে বলুন ওদেরকে।'

'আপনাকে প্রথমে একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে,' শর্ত দিল সার্জেন্ট।

থানায় কোন টাইপরাইটার নেই। বাচ্চা ছেলের মত থেমে থেমে রানার স্টেটমেন্ট লিখতে শুরু করল সার্জেন্ট। প্রতিটি শব্দ নিঃশব্দে বানান করার সময় তার ঠোঁট নড়ছে। রানার ইচ্ছে হলো বল পয়েন্টটা কেড়ে নিয়ে নিজেই লেখে।

'সময় নষ্ট করছেন, সার্জেন্ট। লাশগুলো ওখানে পড়ে রয়েছে। এখানে আমরা বসে আছি, আর খুনীগুলো পালিয়ে যাচ্ছে।'

কোন প্রতিক্রিয়া নেই, বানান করে লিখে যাচ্ছে সার্জেন্ট। প্রায় প্রতিটি শব্দের বানান বলে দিতে হলো রানাকে। হতাশায় মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলেও কিছু করার নেই। তবে লিখতে প্রচুর সময় লাগায় স্টেটমেন্টটা খুব সতর্কতার সঙ্গে দিতে পারল। গতকালের প্রতিটি ঘটনার সময়সূচী দিল ও। চিউইউই ওয়ার্ডেন আলি শাহের কাছ থেকে কখন বিদায় নিয়েছে, হানাদার বাহিনীর ছাপ দেখতে পেয়ে কখন সিদ্ধান্ত নিল চিউইউইয়ে ফিরে যাবার, ফেরার পথে রাস্তার ঠিক কোন জায়গায় দেখল রিফ্রিজারেটর ট্রাক আর মার্সিডিজ।

অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ডের সঙ্গে ওর আলাপের বর্ণনা দেয়ার পর ইতস্তত করল রানা। গণ্ডের জুতো আর স্ল্যাকসে রক্ত দেখেছে, কথাটা বলবে কিনা ভাবছে। বললে অভিযোগের মত শোনাবে।

জাহান্নামে যাক প্রটোকল, রানা সিদ্ধান্ত নিল বলবে। নীল স্ল্যাকসের বর্ণনা দিল ও, বর্ণনা দিল জুতোর-সোলের নিচে মাছের আঁশ আকৃতির নকশা আছে। চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে জেরা করতে বাধ্য হবে পুলিস।

খানিকটা হালকা হলো রানার মন। ধীরে ধীরে বর্ণনা করল চিউইউইয়ে ফেরার পর কি দেখেছে। আলি শাহের মুঠোয় পাওয়া কাগজটার কথা বলল, তাইওয়ানিজ অ্যামব্যাসাডরের নাম উচ্চারণ না করে জানাল অফিস কামরার মেঝেতে দেখা জুতোর ছাপে মাছের আঁশ আকৃতির নকশা আছে।

রিফ্রিজারেটর ট্রাক ও মার্সিডিজকে অনুসরণের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বিপদে পড়ল রানা। চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে ষড়যন্ত্রকারী ও খুনী হিসেবে সন্দেহ করছে ও,

এটা বলা যাবে না। সরাসারি কোন অভিযোগ করা উচিত হবে না। অভিযোগ করলে প্রমাণ সহ করতে হবে। 'ওদেরকে আমি অনুসরণ করি, চুরি যাওয়া আইভরি সম্পর্কে কিছু জানে কিনা জিজ্ঞেস করার জন্যে,' বলল ও। 'প্রথম ট্রাক, পার্টিভুক্ত ও জামেবাসারের চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে আমি ধরতে পারিনি, তবে দ্বিতীয় ট্রাকটা ধরে ফেলি। জাম্বু নামে চিউইউইয়ের একজন রেঞ্জার চালাচ্ছিল ওটা। আমার সঙ্গে তার দেখা হয় কারোই রোডে। এ-সব ঘটনার কিছুই সে জানে না বলে দাবি করল। ট্রাকের ভেতরটা দেখলাম আমি, কোন আইভরি পেলাম না।' জামবু ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে ভেবেই শেষ কথাটা বলা। 'তারপর আমি ভাবলাম, পুলিসকে সব জানানো আমার দায়িত্ব।'

হাতে লেখা স্টেটমেন্ট যখন সই করল রানা তখন চারদিকে রোদ উঠে পড়েছে। এতক্ষণে হারারেতে, সিআইডি হেডকোয়ার্টারে ফোন করল সার্জেন্ট। রিসিভার একবার তোলার পর সহজে নামাতে পারল না সে। একের পর এক অফিসার এলো লাইনে, কেউ কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। অবশেষে কর্মকর্তা গোছের এক অফিসার সার্জেন্টকে ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে চিউইউই যাবার নির্দেশ দিলেন, জানালেন আকাশ-পথেও রওনা হচ্ছে ডিটেকটিভদের একটা টীম, পার্কের এয়ারস্ট্রিপে নামবে তারা।

'আপনি চান আপনার সঙ্গে চিউইউই যাই আমি?' সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করল রানা।

প্রশ্ন শুনে হতভম্ব হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সার্জেন্ট। সিআইডি থেকে সাক্ষি সম্পর্কে কোন নির্দেশ পায়নি সে। 'আপনি বরং ঠিকানা আর ফোন নাম্বার রেখে যান, পরে দরকার হলে আমরা যোগাযোগ করব,' অনেক চিন্তা করার পর সিদ্ধান্ত নিল সে।

মুক্তির একটা স্বাদ অনুভব করল রানা। থানা যদি ওকে আটকে রাখতে চাইত, কিছুই করার ছিল না। চিরুণ্ডু আসার পর চিন্তা-ভাবনার প্রচুর সময় পেয়েছে ও, এরপর কি করা যায় ভেবে রেখেছে। আব্বাস উলুন্দু যদি পোচারদের দু'চারজনকে আটক করতে পারে, চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে নাগালে পাবার পথটা সহজ হয়ে যায়। আটক করা পোচারদের পুলিসের হাতে তুলে দেয়ার আগে আব্বাসের সঙ্গে ওর কথা হওয়া দরকার।

'ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?' সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'থানার টেলিফোন, শুধু পুলিসী কাজে ব্যবহার করা যায়।' মাথা নাড়ল সার্জেন্ট।

পকেট থেকে জিম্বাবুইয়ান দশ ডলারের একটা নোট বের করে ডেস্কের ওপর রাখল রানা, অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে হাত বাড়াল ফোনের দিকে।

কারোই টেলিফোন এক্সচেঞ্জ মানা পুল-এর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতেই অপরপ্রান্তে সাড়া পাওয়া গেল আব্বাস উলুন্দুর।

'আব্বাস,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল রানা, 'কখন ফিরেছ তুমি?'

'এইমাত্র অফিসে পা রাখলাম, রানা সাহেব,' বলল আব্বাস উলুন্দু। 'আমার এক লোক আহত হয়েছে। এখুনি তাকে আমার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

'তারমানে ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ, দেখা হয়েছে। আপনি যেমন বলেছিলেন, রানা সাহেব-বিরাট একটা গ্যাঙ। মন্দ লোক।'

'কাউকে আটক করতে পেরেছ, উলুম্বু?' ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইল রানা। 'ব্যাপারটা খুব জরুরী, অন্তত দু'জনকে যদি আটক করতে পেরে থাকো...'

ছয়

একটা হাত হুইলে, বিশ ফুট লম্বা অ্যাসল্ট বোটে দাঁড়িয়ে রয়েছে আব্বাস উলুম্বু। রাতের অন্ধকারে ভাটির দিকে ছুটছে বোট।

ডেকের নিচে গ্রেটকোট পরা রেঞ্জাররা জড়সড় হয়ে বসে আছে, নদীতে যেমন কুয়াশা, তেমনি ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝেই খক খক করে কেশে উঠে বন্ধ হয়ে যাবার হুমকি দিচ্ছে আউটবোর্ড মোটর। দু'বার বোটটাকে স্রোতের টানে ভেসে যেতে দিয়েছে আব্বাস উলুম্বু, কাজ চালাবার মত মেরামত করে নিয়েছে। তারপর আবার গন্তব্যের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে বোটের।

বেশ স্বাস্থ্যবান চাঁদ উঠেছে আকাশে, জাম্বেজির তীরে গাঢ় ছায়ার মত দাঁড়িয়ে থাকা গাছের সারিগুলো দেখা যাচ্ছে। উলুম্বুর জন্যে এই আলোই যথেষ্ট, ফুলস্পীডে বোট চালাচ্ছে সে। সামনের পঞ্চাশ মাইল, সেই মোজাম্বিক সীমান্ত পর্যন্ত, নদীর প্রতিটি বাঁক তার চেনা।

মোটর খুব একটা শব্দ করছে না। নদীর কিনারায় নলখাগড়ার বনে সতর্ক হবার সুযোগ পেল না প্রকাণ্ডদেহী একদল জলহস্তী, ওগুলোর পাশে চলে এল তারা। পিচ্ছিল ঢাল বেয়ে তাড়াহুড়ো করে পানিতে নামতে গিয়ে কয়েকটা হড়কে গেল, আছাড়ও খেল দু'একটা। বুনো হাঁসগুলো, লেগুনের শান্ত পানিতে ছিল, জলহস্তীর চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক–অ্যাসল্ট বোটের আগমন টের পেয়ে আকাশে উঠে পড়ল ঝাঁকে ঝাঁকে, প্রায় ঢাকা পড়ে গেল চাঁদটা।

ঠিক কোথায় যাচ্ছে পরিষ্কার ধারণা আছে আব্বাস উলুম্বুর। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল সে, এই নদী পথে কয়েকশো বার আসা-যাওয়া করেছে। পোচাররা কি ধরনের কৌশল অবলম্বন করে জানা আছে তার। তাদের মধ্যে অনেকেই তার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে ছিল, যদিও এখন তারা দেশ ও জাতির শত্রু।

মানা পুল আর চিরুণ্ডুর নিচে জাম্বেজি এখানে প্রায় আধ মাইল চওড়া। তীব্র স্রোতের মধ্যে নদী পেরোবার জন্যে পোচারদের জলযান দরকার হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় গেরিলারা যেভাবে ক্যানু যোগাড় করত, এখন ওরাও সেভাবে যোগাড় করে–জেলেদের কাছ থেকে।

জাম্বেজি তার তীরে বিপুলসংখ্যক জেলে পরিবারকে ঠাঁই দিয়েছে, ব্যবস্থা রেখেছে তাদের ভরণপোষণের। জেলেদের গ্রামগুলো অস্থায়ী, দায়ী হলো জাম্বেজির মেজাজ। নদী যখন তার তীর ভাসিয়ে দেয়, উঁচু জমিতে উঠে যেতে হয়

জেলেদের। সেখানেও মাছ পাওয়া যায়, জাম্বেজির তীরেই আবার তৈরি হয় নতুন গ্রাম।

জেলেরা কখন কোনদিকে যাচ্ছে তার খোঁজখবর রাখা আব্বাস উলুন্দুর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কারণ নদীটাকে তারা কিভাবে ব্যবহার করছে তার ওপর নির্ভর করে নদীর ইকোলজি।

রাতের বাতাসে শুকনো মাছ আর ধোঁয়ার গন্ধ পেল সে। এঞ্জিন বন্ধ করে নিঃশব্দে এগোল উত্তর পারের দিকে। পোচাররা যদি জাম্বিয়া থেকে এসে থাকে, ওই জায়গাতেই ফিরে যেতে হবে তাদের।

তীরে চারটে কুঁড়ে আর একটা দোচালা দেখা গেল। ওগুলোর নিচে অপ্রশস্ত সৈকতে চারটে ক্যানূ। তীরে নেমে রেঞ্জারদের নিয়ে এগোল উলুন্দু, বোটের পাহারায় থাকল একজন রেঞ্জার। একটা কুঁড়ের নিচু দরজা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল এক বৃদ্ধা আদিবাসী। তার কোমরে হরিণের চামড়া জড়ানো, ওপরে আর কিছু নেই।

'আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, বুড়ি মা,' শ্রদ্ধার সঙ্গে বলল উলুন্দু। জেলেদের সবার সঙ্গেই তার সম্পর্ক ভাল।

'আমিও তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, লক্ষ্মী সোনা।' দাঁতহীন মাড়ি বের করে হেসে উঠল বুড়ি। নাক কোঁচকাল উলুন্দু, বুড়ির গা থেকে ভাং-এর গন্ধ ছড়াচ্ছে। বাতোনকা আদিবাসীর লোকেরা ভাং-এর সঙ্গে গোবর মিশিয়ে রোদে শুকায়, তারপর মাটির তৈরি পাইপে ভরে ধূমপান করে।

'পুরুষরা সবাই কি কুঁড়েতে আছে?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল আব্বাস উলুন্দু। 'তোমাদের সব ক্যানূ সৈকতে?'

জবাব দেয়ার আগে নাক ঝাড়ল বুড়ি। 'আমার সব ছেলে আর তাদের বউরা ঘরের ভেতর ঘুমাচ্ছে। ওদের সঙ্গে বাচ্চারাও ঘুমাচ্ছে।'

'বন্দুক হাতে কোন অচেনা লোকদের তাহলে দেখোনি তুমি, বুড়ি মা? নদী পেরোবার জন্যে ক্যানূ চাইছিল?'

'না রে, সোনা।'

'তোমাকে সালাম জানাই, বুড়ি মা,' বলে বুড়ির হাতে চিনি ভর্তি ছোট একটা প্যাকেট গুঁজে দিল উলুন্দু। 'শান্তিতে থাকো গো!'

আবার রওনা হলো বোট। পরবর্তী গ্রাম আরও তিন মাইল ভাটিতে। গ্রামের সর্দারকে চেনে উলুন্দু, মাছ শুকানোর আগুনের পাশে একা বসে থাকতে দেখল তাকে। কোরাসরত কালো মেঘ অর্থাৎ মশা তাড়াচ্ছে আর পাইপ টানছে। বিশ বছর আগে সর্দার একটা পা ফেলে এসেছে এক কুমীরের পেটে, তবে আজও নদীর এদিকটায় সেরা মাঝি সে। সালাম দিয়ে তার সামনে দাঁড়াল সে, হাতে গুঁজে দিল এক প্যাকেট সিগারেট, তারপর পাশে বসে পড়ল। 'তুমি একা কেন বসে আছ, বাবা? আমাকে বলো কেন তুমি ঘুমাতে পারছ না। কিছু ঘটেছে বুঝি?'

'দুশ্চিন্তা ছাড়া বুড়োদের আর কি-ই বা করার থাকে রে বাপ!'

'দুশ্চিন্তা তো এই কারণে—একদল লোক, হাতে বন্দুক, তোমার কাছে ক্যানূ

চেয়েছে?' জানতে চাইল উলুম্বু। 'ওদের দাবি তুমি মিটিয়েছ তাহলে?'

মাথা নাড়ল বুড়ো সর্দার। 'আমাদের এক বাচ্চা দেখে ফেলে জলা পেরুচ্ছে ওরা, ছুটে এসে খবর দেয় গ্রামে। নলখাগড়ার বনে ক্যানুগুলো লুকিয়ে ফেলার সময় পাই আমরা, তারপর জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ি।'

'কতজন ছিল তারা? কখনকার ঘটনা, বাবা?'

দুটো হাতের সবগুলো আঙুল দু'বার দেখাল সর্দার। 'সিংহের মুখ তাদের, হাতে বজ্র,' ফিসফিস করল সে। 'আমরা ভয় পেয়ে যাই। ঘটনা কাল রাতের আগের রাতের।'

'ক্যানু পেল না, তারপর তারা কি করল?'

'নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করল, তারপর চলে গেল ওদিকে,' বলে পুব দিকটা দেখিয়ে দিল সর্দার। 'কিন্তু এখন আমার ভয় হচ্ছে আবার না তারা ফিরে আসে। সেজন্যেই একা জেগে বসে আছি, বাপ।'

'ম্বেপুরার লোকেরা কি এখনও লাল পাখির আস্তানায় আছে?' জানতে চাইল আব্বাস উলুম্বু।

মাথা ঝাঁকাল বুড়ো। 'আমারও ধারণা, এখান থেকে ম্বেপুরাদের গ্রামেই গেছে তারা।'

'তোমাকে সালাম জনাই, বুড়ো বাপ।'

ম্বেপুরাদের গ্রাম নদীর উত্তর পারে। মাটির একটা চওড়া পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে, ওখানে ডিম পাড়ে যাযাবর পাখিরা। এঞ্জিন বন্ধ রাখল উলুম্বু, বৈঠা চালিয়ে এগোল। রেঞ্জাররা সবাই সতর্ক হয়ে গেছে। গ্রেটকোট খুলে অস্ত্র তুলে নিয়েছে হাতে।

এ গ্রামটাও পানির কিনারায়। দেখে মনে হলো খালি পড়ে আছে। মাছের র‍্যাকগুলোর নিচে নিভে গেছে আগুন। চাঁদের আলোয় দেখা গেল কাদাময় সৈকতে ক্যানু বাঁধার পোলগুলো রয়েছে, কিন্তু কোন ক্যানু নেই। জেলেরা বেঁচেই থাকে ক্যানুর ওপর নির্ভর করে, ওগুলো তাদের অমূল্য সম্পদ।

গ্রামটাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসে এঞ্জিন স্টার্ট দিল উলুম্বু। খোলা আধ মাইল নদী পেরিয়ে দক্ষিণ পারের দিকে যাচ্ছে ওরা। পোচাররা যদি এখানে নদী পেরিয়ে থাকে, ফিরতি পথেও এখান দিয়ে যাবে তারা।

সময়ের একটা হিসেব করল উলুম্বু। হিসেব করল এই জায়গা থেকে চিউইউইয়ের দূরত্ব, দূরত্বটুকু পেরোতে কতক্ষণ সময় নেবে পোচাররা। লোকগুলো সম্ভবত অত্যন্ত ভারি আইভরি বহন করছে। মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকাল সে। ভোর এগিয়ে আসার সাথে সাথে ম্লান হয়ে আসছে ওটা। তার ধারণা হলো, নদী পেরোবার জন্যে আগামী দুই কি তিন ঘণ্টার মধ্যে এখানে ফিরে আসবে পোচাররা।

ম্বেপুরায় ক্যানু থাকার কথা সাত কি আটটা, প্রতিটি কাইজেলিয়া গাছের বিশাল লগ দিয়ে তৈরি। নদী পেরোবার সময় এক একটায় বসতে পারবে ছয় কি সাতজন। মাঝি হিসেবে গ্রাম থেকে কিছু লোককে ধরে নিয়ে গেছে পোচাররা, ধারণা করল উলুম্বু। ক্যানু সামলানো সহজ কাজ নয়, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাগে।

আন্দাজ করল, নদীর দক্ষিণ তীরে মাঝিদেরকে রেখে চিউইউইয়ে গেছে তারা। মাঝিদের পাহারা দেয়ার জন্যে নিজেদের একজনকে রেখে গেছে।

ক্যানুগুলোর সন্ধান পেলে একটা কাজ হয়। বোটের নাক সামান্য ঘোরাল সে, একটা লেগুনে ঢোকার পথ দেখতে পেয়ে প্যাপিরাসের ঘন বনে ঢুকে পড়ল।

লেগুনের বেশ খানিকটা ভেতরে ঢুকে পড়ল বোট। এঞ্জিন বন্ধ রাখা হয়েছে। প্যাপিরাসের ডাঁটা মুঠোয় ধরে টান দিচ্ছে রেঞ্জাররা, তাতেই ধীরগতিতে এগোচ্ছে বোট। হাতে একটা বৈঠা নিয়ে পানির গভীরতা মাপছে উলুম্বু।

অগভীর পানিতে পৌঁছে একজন রেঞ্জারকে নিয়ে তীরে উঠল সে, বাকি সবাই বোটের পাহারায় থাকল। শুকনো মাটিতে উঠে ফিসফিস করে নির্দেশ দিল উলুম্বু, ক্যানুর খোঁজে রেঞ্জারকে পাঠিয়ে দিল ভাটির দিকে। নিজে গেল উল্টো অর্থাৎ উজানের দিকে। ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে দ্রুত এগোল সে।

নিজের বুদ্ধির তারিফ করল আব্বাস উলুম্বু। আধ মাইলও এগোয়নি, ধোঁয়ার গন্ধ ঢুকল নাকে। এদিকের তীরে কোন লোকবসতি নেই, আর নদীর ওপার এত দূর যে ধোঁয়ার গন্ধ পৌঁছুবে না।

ধীর, নিঃশব্দ পায়ে এগোল উলুম্বু। এদিকটায় নদীর তীর লাল মাটির প্রাচীর বিশেষ। সামনে সরু একটা নালা দেখে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল সে।

ভোরের অস্পষ্ট আলোয় নিচের নালায় উঁকি দিল উলুম্বু। ক্যানুগুলো পানি থেকে যথেষ্ট দূরে তুলে আনা হয়েছে, বোট নিয়ে কেউ খোঁজ করলে যাতে দেখতে না পায়। মোট সাতটা ক্যানু।

কাছাকাছি দু'জায়গায় আগুন জ্বলছে, আগুনের পাশে শুয়ে রয়েছে মাঝিরা। দেখে মনে হলো লাশ–হরিণের চামড়া দিয়ে আপাদমস্তক ঢাকা। দুটো আগুনের ধারে একজন করে সশস্ত্র পোচার বসে আছে, কোলের ওপর এ/কে ফরটিসেভেন রাইফেল।

রানা সাহেব ঠিকই আন্দাজ করেছেন, ভাবল উলুম্বু, হানাদার বাহিনী ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা। নালার কিনারা থেকে পিছিয়ে এল সে, তারপর ঘুরপথে এগোল। দুশো গজ এগোবার পর সরু একটা পথ পেল সে, পশুরা চলাচল করে। পথটা দক্ষিণ অর্থাৎ চিউইউই হেডকোয়ার্টার ক্যাম্পের দিকে চলে গেছে।

পথটা ধরে খানিক দূর এগোল উলুম্বু। শুকনো একটা নালায় নেমে গেছে পথ, নালার মেঝেতে সাদা বালির ওপর দাগগুলো যে পায়ের ছাপ ভোরের অনিশ্চিত আলোতেও পরিষ্কার বোঝা গেল। লাইন বন্দী হয়ে অনেকগুলো লোক হেঁটে গেছে এই পথে। চ্যাপ্টা, ভোঁতা হয়ে গেছে দাগগুলো, লোকগুলো যাবার পর এইপথে পশুরাও চলাচল করেছে। চব্বিশ ঘণ্টা আগের ছাপ, আন্দাজ করল সে। জানা কথা, এই পথ ধরেই ফিরে আসবে তারা। নদী পেরুতে হলে ক্যানুগুলো দরকার হবে তাদের।

ঝোপের ভেতর ভাল একটা আড়াল খুঁজে নিল সে, এখান থেকে পথটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। তার পিছন দিকে অগভীর একটা নালা রয়েছে, শুকনো, প্রয়োজনে পালাবার পথ হিসেবে কাজ দেবে, দু'পাশে লম্বা ঘাস।

ভোর হয়ে গেল। চারদিক থেকে ভেসে আসছে পাখির ডাক। মাথার ওপর ডানা ঝাপটে উড়ে যাচ্ছে বুনো হাঁসের ঝাঁক। দিনের আলোয় পথটার আরও অনেক দূর পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে উলুম্বু।

দূরে কোথাও একটা বেবুন ডেকে উঠল। একজনের ডাকে সাড়া দিল বাকি সবাই। সতর্ক হবার সংকেত। এক সময় থামল তারা, জঙ্গলের আরও ভেতর দিকে সরে গেল। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে উলুম্বুর স্নায়ু।

পনেরো মিনিট পর পথের ওপর লোকগুলোকে দেখতে পেল সে। প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করে হাতির দাঁত আর এ/কে ফরটিসেভেন রাইফেল। লোকগুলোর কাপড়চোপড় ছেঁড়া ও নোংরা। প্রায় সবার মাথায় ক্যাপ। হাতির দাঁত কেউ মাথায় নিয়েছে, কেউ কাঁধে। সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে আসছে দলটা, দর দর করে ঘামছে।

লাইনের সামনের লোকটা একটু খাটো, তবে চওড়া ও শক্ত-সমর্থ। তাকে দেখেই চিনতে পারল উলুম্বু। ওর নাম পিটার গুচ, জাম্বিয়ান পোচারদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত। এর আগেও দু'বার মুখোমুখি হয়েছে তারা, প্রতিবার কিছু ভাল মানুষ মারা গেছে।

উলুম্বু যেখানে শুয়ে আছে তার কাছাকাছি মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে গেল গুচ। ঠিক হাঁটা বলে না, ঘোড়ার মত দুলকি চালে দৌড়াচ্ছে। গোটা দলের মধ্যে একা তার চেহারাতেই ক্লান্তির কোন চিহ্ন নেই।

পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে পোচাররা, গুণল উলুম্বু। দুর্বল লোকগুলো পিছিয়ে পড়েছে, সবগুলো লোককে গুণতে প্রায় সাত মিনিট লাগল তার। উনিশ জন।

বোটের কাছে ফিরে এসে উলুম্বু দেখল ভাটির দিকে পাঠানো তার লোকটা ফিরে এসেছে। কি দেখেছে, এখন কি করতে হবে, সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিল সে তার রেঞ্জারদের। পোচারদের কাছে আইভরি আছে, আর জিম্বাবুইয়ের আইন হলো পোচারদের দেখামাত্র গুলি করা যাবে।

খোলা পানিতে বেরিয়ে এসেই মোটর স্টার্ট দিল আকাস উলুম্বু। খক খক করে উঠল এঞ্জিন, স্টার্ট নিলেও বন্ধ হয়ে গেল আবার। বারবার চেষ্টা করল সে, কোন লাভ হচ্ছে না। এদিকে ভাটির দিকে ভেসে যাচ্ছে বোট।

রেগেমেগে এঞ্জিনের কাভার খুলে কাজ শুরু করল সে। অস্থিরতা অনুভব করছে, জানে ক্যানূতে আইভরি তুলে নদীর ওপারে পৌঁছুনোর আয়োজন করছে পোচাররা। হয়তো এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছে তারা।

এঞ্জিনে কাভার না লাগিয়েই সামনে, কন্ট্রোলে চলে এল সে। এবার স্টার্ট নেয়ার পর আর বন্ধ হলো না মোটর।

কাভারবিহীন মোটরের আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত যাচ্ছে, সাবধান হবার সুযোগ করে দিচ্ছে পোচারদের। পরবর্তী বাঁকটা ঘুরতেই উলুম্বু দেখল, নদীর ওপর ছড়িয়ে রয়েছে ক্যানূগুলো, দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে নদীর অপর পারে।

উলুম্বুর পিছনে সূর্য উঠছে, সামনে নদীর বিস্তৃতি থিয়েটার স্টেজ-এর মত। জাম্বেজির পানি উজ্জ্বল পান্না সবুজ, রোদ লেগে সোনালি হয়ে আছে প্যাপিরাস বন।

প্রতিটি ক্যানূতে একজন করে মাঝি, তিনজন করে আরোহী, তিনটে করে হাতির দাঁত। সামনের ক্যানূটা জাম্বিয়ান তীরের একশো গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে এরইমধ্যে।

ওটার পথে বাধা দেয়ার জন্যে বোটটাকে তির্যকভাবে ছোটাল উলুম্বু। দুটো জলযান এক হতে যাচ্ছে, গুচকে দেখতে পেল সে। ক্যানূর বোর কাছ থেকে হাঁটুভঙ্গিতে পিছন ফিরে আছে সে, কটমট করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। কিন্তু নড়তে পারছে না গুচ, নড়লেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে ক্যানূ।

'এবার তোমাকে আমরা পেয়েছি,' বিড় বিড় করল উলুম্বু, সামনের দিকে ঠেলে দিল থ্রটল।

হঠাৎ করে সিধে হয়ে দাঁড়াল গুচ, পায়ের নিচে দোল খেতে শুরু করল ক্যানূ। কিনারা দিয়ে পানি উঠছে হুহু করে, ডেবে যাচ্ছে নিচের দিকে। উলুম্বুর উদ্দেশে গর্জে উঠল সে, হুমকি দিয়ে কি যেন বলছে। তারপর রাইফেল তুলে দীর্ঘ এক পশলা গুলি করল অ্যাসল্ট বোটের দিকে।

ফাইবার গ্লাস খোলে বৃষ্টির মত আঘাত করল বুলেট। উলুম্বুর সামনে, কন্ট্রোল কনসোল-এর একটা ইন্সট্রুমেন্ট গজ বিস্ফোরিত হলো। ঝট করে মাথা নামাল সে, তবে বোটের কোর্স ঠিক রাখল, ক্যানূটাকে ধাক্কা দেবে।

খালি ম্যাগাজিন ফেলে দিয়ে নতুন আরেকটা ভরল গুচ, গুলি করল আবার। ব্রীচ থেকে ছিটকে বেরুনো তামার কেসগুলো রোদ লেগে ঝিক ঝিক করছে। একজন রেঞ্জার আর্তনাদ করে উঠল, পেট চেপে ধরে পড়ে গেল ডেকের ওপর, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ত্রিশ নট গতিতে ক্যানূর গায়ে ধাক্কা দিল অ্যাসল্ট বোট। কাইজেলিয়া কাঠ ফেটে গেল, আরোহীরা ছিটকে পড়ল পানিতে।

সংঘর্ষের আগের মুহূর্তে রাইফেল ফেলে দিয়ে নদীতে লাফ দিল গুচ। দ্রুতগতি খোলটাকে এড়াবার জন্যে পানির গভীরে ডুব দিতে চেষ্টা করল সে। আশা, পানির ওপর মাথা না তুলেই নলখাগড়া বনের কিনারায় পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু বাতাসে ভরে রয়েছে তার ফুসফুস, যথেষ্ট গভীরে ডুব দিতে পারল না। মাথা নিচের দিকে তাক করা, পা দুটো পানির মাত্র কয়েক ইঞ্চি গভীরে। অ্যাসল্ট বোটের ইয়াহামা প্রপেলার সবটুকু শক্তিতে ঘুরছে, নাগালে পেয়ে গেল তার বাম পা। রুটি কাটার ছুরির মত নিখুঁতভাবে প্রপেলার গোড়ালি থেকে কেটে নিল পা-টা, হাঁটুর পিছন পর্যন্ত হাড় বাদ দিয়ে সমস্ত মাংস ছিন্নভিন্ন করে দিল।

তাকে পিছনে রেখে সামনে চলে এল অ্যাসল্ট বোট, হুইল ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ বাঁক নিচ্ছে উলুম্বু। আরেকটা ক্যানূকে ধাক্কা দেয়ার জন্যে ছুটছে বোট, কাত হয়ে আছে একদিকে। গতি এতটুকু না কমিয়ে ক্যানূটার ওপর লাফিয়ে পড়ল বোট, চুরমার করে দিল খোলটা, আরোহীরা নিক্ষিপ্ত হলো নদীতে। আবার তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে ঘুরতে শুরু করেছে বোট।

তৃতীয় ক্যানূর আরোহীরা বোটটাকে আসতে দেখে সংঘর্ষের এক মুহূর্ত আগে লাফিয়ে পড়ল পানিতে। তীব্র স্রোতে ভেসে গেল তারা।

বোট ঘুরিয়ে নিল উলুম্বু। পরের ক্যানূটা সরাসরি সামনে চলে এল।

আরোহীরা আর্তনাদ করছে, দয়া ভিক্ষা চাইছে, গুলি করছে এলোপাতাড়ি। অ্যাসল্ট বোটের চার ধারে বুলেট বৃষ্টি হচ্ছে, ঝর্ণার মত লাফিয়ে উঠছে পানি। ধাক্কা খেয়ে গুঁড়ো হয়ে গেল ক্যানুটা, সেটাকে পিষে ছুটে গেল বোট।

বাকি ক্যানুগুলো মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যাচ্ছে দক্ষিণ তীরে, মরিয়া হয়ে বৈঠা চালাচ্ছে আরোহীরা। অনায়াসে সেগুলোকে পাশ কাটাল উলুন্দু, সবচেয়ে কাছের ক্যানটার পিছনে বোট তুলে দিল। ইঙ্গিত করল এঞ্জিন, কেঁপে উঠল বোট, কারণ জ্যান্ত মানুষের মাংসে কামড় বসাচ্ছে প্রপেলার। পরমুহূর্তে এগিয়ে গেল বোট।

শেষ ক্যানুগুলো দক্ষিণ তীরে পৌঁছে গেছে, ছড়িয়ে পড়েছে পোচাররা, চেষ্টা করছে খাড়া প্রাচীর বেয়ে ওপরে ওঠার। তাদের আঙুলের ফাঁক গলে ঝুর ঝুর করে খসে পড়ছে লাল মাটি।

থ্রটল পিছিয়ে আনল উলুন্দু, বো ঘোরাল উজানের দিকে, স্রোতের মধ্যে স্থির রাখল বোটটাকে। 'আমি পার্কের একজন ওয়ার্ডেন,' পোচারদের উদ্দেশে চিৎকার করল সে। 'তোমাদেরকে গ্রেফতার করা হলো। পালাবার চেষ্টা করো না, তাহলে গুলি খেয়ে মরবে।'

প্রাচীর বেয়ে উঠতে না পেরে বোটের দিকে ঘুরে গুলি করল একজন পোচার।

'কিল!' নির্দেশ দিল উলুন্দু, দেখতে পেল পোচাররা সবাই গুলি করতে যাচ্ছে।

তৈরি হয়েই ছিল রেঞ্জাররা। নদীর তীর ঝাঁঝরা করে দিল ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। অ্যান্টি-পোচিং ইউনিটের ট্রেনিং পাওয়া লোক, প্রত্যেকে দক্ষ মার্কসম্যান। শুরু হতে না হতে শেষ হয়ে গেল টার্গেট প্র্যাকটিস।

বোট ঘুরিয়ে নিয়ে নদীর অপর পারের দিকে এগোল আবার উলুন্দু।

মুখে কাটা দাগ, পিটার গুচ, সেই হলো দলনেতা। মাথা পিছু অল্প কয়েক ডলার দিলেই নতুন দল গড়ে নেবে সে। তাকে যদি অচল করা না যায়, আগামী হপ্তায় বা আগামী মাসে আরেক দল পোচার সীমান্ত পেরোবে। সাপের মাথা কাটতে হবে, তা না হলে আবার ছোবল দেবে সে।

উত্তর তীর, নলখাগড়ার বনরেখা লক্ষ্য করে ছুটছে উলুন্দুর বোট, যেখানে প্রথম ক্যানুটাকে ডুবিয়েছে। কাছাকাছি এসে থ্রটল টেনে ধরল সে, স্রোতের টানে বোটকে ভেসে যেতে দিল ভাটির দিকে। তার কয়েক গজ পাশে নলখাগড়ার বন।

পোর্ট রেইলে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন রেঞ্জার, কড়া নজর রাখছে নলখাগড়ার ওপর।

প্যাপিরাসের আশ্রয় পাবার আগে জাম্বেজির স্রোত কতদূরে টেনে নিয়ে গেছে গুচকে বলা কঠিন। বোট নিয়ে ভাটির দিকে মাইলখানেক দেখবে উলুন্দু, তারপর লোক নিয়ে তীরে উঠবে। আহত হয়েছে গুচ, বেশিদূর পালাতে পারেনি সে। যত দূরেই পালাক, আজ তাকে ছাড়া হবে না।

নদীর জাম্বিয়ান দিকটায় কাউকে গ্রেফতার করার অধিকার নেই উলুন্দুর। তবে সে একজন খুনী ও কুখ্যাত ডাকাতকে ধাওয়া করছে। চ্যালেঞ্জ করা হলে যুদ্ধ

করার জন্যে মনে মনে তৈরি হয়ে আছে সে। জাম্বিয়ান পুলিস যদি নাক গলায়, যদি গুচকে ফেরত চায়, বন্দীর মাথায় গুলি করবে সে।

চোখের কোণে কি যেন ধরা পড়ল। বোট দাঁড় করাল উলুম্বু। নলখাগড়ার বন এক জায়গায় ভেঙে মত গেছে, যেন কিছু একটা টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জায়গাটার ওপর দিয়ে। সম্ভবত কোন কুমীর নেমে গেছে পানিতে। কিন্তু না, কুমীর হলে নলখাগড়ার ডাঁটিগুলো ওভাবে মোচড়াত না। দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন মুঠোর ভেতর ধরেছিল ওগুলো।

'কুমীরের হাত থাকে না,' বিড়বিড় করল উলুম্বু, আরও কাছে নিয়ে এল বোট। ব্যাপারটা ঘটেছে মাত্র কয়েক মিনিট আগে, কারণ তার চোখের সামনে নুয়ে পড়া নলখাগড়া ধীরে ধীরে সিধে হচ্ছে, ফিরে যাচ্ছে নিজেদের খাড়া ভঙ্গিতে। তারপর আপনমনে হাসল উলুম্বু। নলখাগড়ায় রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছে সে।

'রক্ত! শুয়োরটা পালাতে পারেনি...!'

শেষ হলো না কথাটা, ওদের সামনে নলখাগড়ার বনে কে যেন আর্তনাদ করে উঠল। রক্ত হিম করা আর্ত চিৎকার, মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে গেল সবাই।

সবার আগে সংবিৎ ফিরল উলুম্বুর। থ্রটলে সামান্য টান দিল সে, ঘন বনে জোর করে ঢুকে পড়ল বোটের নাক। ওদের সামনে কোথাও এক লোক বিরতিহীন চিৎকার করছে।

নলখাগড়ার ভেতর ধীরে ধীরে ঢুকছে বোট। হঠাৎ করে সামনে খানিকটা খোলা পানি দেখা গেল। বো-র সরাসরি সামনে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হচ্ছে পানি, ছিটকে ঝর্ণার মত ওপরে উঠছে, তারপর ওদের মাথার ওপর রোদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

ফেনার ভেতর কর্কশ আঁশঅলা একটা প্রকাণ্ড দেহ গড়াগড়ি খাচ্ছে, ঘোলা করছে পানি। মাখনের মত হলুদ তার পেট। লম্বা লেজে তীক্ষ্ণ আঁশ, ঘন ঘন আছাড় মেরে সাদা করে ফেলছে পানি।

হঠাৎ মানুষের একটা হাত পানির ওপর উঠে এল। চরম আতঙ্কে অস্থির একটা হাত। সামনের দিকে ঝুঁকে খপ করে কব্জিটা ধরে ফেলল উলুম্বু। ভিজে চামড়া পিচ্ছিল হয়ে আছে, দু'হাতে ধরে পিছন দিকে হেলান দিল সে, লোকটাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে পানির নিচে থেকে।

একদিকে গুচ আর কুমীর, আরেক দিকে একা উলুম্বু। কব্জিটা মুঠোর ভেতর থেকে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত এগিয়ে এসে একজন রেঞ্জার গুচের বাহু ধরে ফেলল, কনুইয়ের কাছটায়।

দু'জন মিলে লোকটাকে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে পানির ওপর তুলল ওরা। ভয়ংকর নির্যাতনের শিকার গুচ। পানির ওপর রেঞ্জাররা আর পানির নিচে কুমীর, দু'দলের মাঝখানে লম্বা হয়ে আছে সে, টেনে আরও লম্বা করা হচ্ছে।

অপর রেঞ্জার বোটের কিনারা থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকে পানিতে এক পশলা গুলি করল। পানির সারফেসে হাই-ভেলোসিটি বুলেট এমনভাবে বিস্ফোরিত হলো যেন ইস্পাতের মোটা পাতে বাধা পেয়েছে। কোন প্রতিক্রিয়া হলো না, শুধু পানির

ছিটা এসে তীরের মত বিঁধল রেঞ্জার আর উলুম্বুর মুখে।

'স্টপ!' চিৎকার করল উলুম্বু। 'আমাদের লোক আহত হবে!'

রাইফেল ফেলে দিয়ে আবার গুচের বাহু আঁকড়ে ধরল রেঞ্জার। টাগ-অভ-ওঅর চলছে, উলুম্বুর দলে এখন তিনজন লোক। ধীরে ধীরে গুচের শরীরটা পানির ওপর তুলে আনছে তারা, যতক্ষণ না কুমীরটার প্রকাণ্ড মাথা পানির ওপর দেখা গেল।

কুমীরের দাঁত গুচের পেটের ভেতর ডুবে গেছে। দাঁতগুলো ধারাল হয় না, ওগুলো ব্যবহার করে শিকারকে আটকে ধরার জন্যে, তারপর পানিতে গোটা শরীর পাক খাইয়ে মুচড়ে ছিঁড়ে আনে একটা পা বা হাত, কিংবা বড় এক টুকরো মাংস। ওরা ধরে আছে, বোটের কিনারায় ছড়িয়ে পড়ল গুচ, পানিতে লেজ আছড়ে পাক খেলো কুমীর। ফড়ফড় করে ফেড়ে গেল গুচের পেট। দাঁতগুলো এখনও ডুবে আছে গুচের পেটে, পিছু হটল কুমীর, গুচের শরীর থেকে নাড়িভুঁড়ি সব বের করে নিয়ে গেল।

প্রতিপক্ষ ঢিল দিতে ওরা তিনজন গুচকে বোটের ওপরে টেনে আনল। তবে এখনও কুমীরটা ছাড়েনি তাকে। ডেকের ওপর মোচড় খাচ্ছে গুচের শরীর, বোটের কিনারা থেকে বেশ অনেকটা দূর পর্যন্ত লম্বা হয়ে আছে তার নাড়িগুলো, যেন ঝুলে রয়েছে গোছা গোছা টিউব আর রিবন।

লেজের সমস্ত শক্তি দিয়ে আবার ঝাঁকি মারল কুমীর। রিবন আর টিউবগুলো একটানে ছিঁড়ে গেল সব, শেষবারের মত চিৎকার করে উঠল গুচ, মরে গেল রক্তাক্ত ডেকে একবার পা ছুঁড়ে।

কিছুক্ষণ শুধু ওদের তিনজনের দ্রুত নিঃশ্বাসের আওয়াজ শোনা গেল। সবাই বীভৎস লাশটার দিকে তাকিয়ে আছে। নিস্তব্ধতা ভাঙল উলুম্বু, ফিসফিস করে শোনা ভাষায় বলল, 'আমার হাতে তোমার মৃত্যু এরচেয়ে কষ্টকর হত না। প্রার্থনা করি তোমার ওপর যেন শান্তি বর্ষিত না হয়। পরপারের দীর্ঘ যাত্রায় তোমার অন্যায় আর পাপ যেন তোমার সঙ্গেই থাকে।'

সাত

'না, রানা সাহেব, পোচারদের কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি,' রানাকে টেলিফোনে বলল আব্বাস উলুম্বু।

'কি বললে? আটকাতে পারোনি?' চিৎকার করছে রানা, বৃষ্টির পর লাইনটা ঠিকমত কাজ করছে না।

'না, রানা সাহেব,' গলা চড়াল উলুম্বু। 'মারা গেছে আটজন, বাকি সবাই হয় কুমীরের পেটে গেছে নয়তো ফিরে গেছে জাম্বিয়ায়।'

'আর আইভরি? ওদের সঙ্গে আইভরি ছিল না?'

'হ্যাঁ, সবার কাছেই ছিল, কিন্তু ক্যানুর সঙ্গে সব ডুবে গেছে নদীতে।'

'যাহ্,' রানার গলায় খেদ। কর্তৃপক্ষকে এখন বোঝানো আরও কঠিন হবে যে চিউইউই থেকে প্রায় সবগুলো আইভরি রিফ্রিজারেটর ট্রাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চণ্ডমুণ্ড গঙ দায়ী, এটা প্রমাণ করার সুযোগ প্রতি ঘণ্টায় একটু একটু করে কমে যাচ্ছে।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'এখান থেকে একটা পুলিস ইউনিট রওনা হয়েছে'

'হ্যাঁ, রানা সাহেব। ওরা এই মুহূর্তে মানা পুলে, আমাদের এখানে রয়েছে। আমার আহত রেঞ্জারকে হারারেতে পাঠিয়ে দিয়েই ওদের সঙ্গে যোগ দেব আমি। দেখতে চাই বেজন্মা কুত্তাগুলো কি করেছে আলি শাহের।'

'শোনো, উলুম্বু। একটা মাত্র ক্লু আছে আমার হাতে, যারা দায়ী তাদের একজনকে ধরতে যাচ্ছি আমি। তুমি…।'

'খুব সাবধানে, রানা সাহেব। এরা ভয়ানক হিংস্র জানোয়ার। আপনি মারাত্মক বিপদে পড়তে পারেন। কোথায় যাচ্ছেন আপনি, কার খোঁজে?'

'দেখা হলে সব বলব, উলুম্বু,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা, ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রেখে পুলিস স্টেশন থেকে বেরিয়ে ল্যাণ্ডক্রুজারে চড়ল।

চুপচাপ বসে কিছুক্ষণ চিন্তা করল ও। উপলব্ধি করতে পারছে, এই সময়টা আসলে মধ্যবর্তী অবসর, সাময়িক বিরতি। খুব তাড়াতাড়ি আবার ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইবে জিম্বাবুই পুলিস, আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব নিয়ে। বিপদ ও ঝামেলা এড়াতে হলে জিম্বাবুই থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। সূত্রটাও ওকে সেদিকে নিয়ে যেতে চাইছে।

কাস্টমস অ্যাণ্ড ইমিগ্রেশন পোস্ট-এ চলে এল রানা, ব্যারিয়ারের সামনে পার্কিং এরিয়ায় ল্যাণ্ডক্রুজার থামাল। দেশ ত্যাগের আনুষ্ঠানিকতা সারতে আধ ঘণ্টারও কম লাগল, আফ্রিকার মান অনুসারে প্রায় একটা রেকর্ড সময় বলা যায়।

জাম্বেজির ওপর লোহার পাত দিয়ে ঘেরা ব্রিজটা পেরিয়ে এল রানা। জানে, এটাও কোন স্বর্গে ঢুকছে না ও। ইউগাণ্ডা আর ইথিওপিয়ার পর জাম্বিয়া হলো আফ্রিকা মহাদেশের দরিদ্রতম দেশ। দুর্নীতি দখল করে আছে দেশটাকে, আর বিশৃঙ্খলা পেছন দিকে টেনে রেখেছে।

জাম্বিয়ান দিকটায় এসে এক অফিসারের মুখোমুখি হলো রানা। জানতে চাইল, 'আচ্ছা, বলতে পারেন, কাল রাতে আমার এক বন্ধু এই পথ দিয়ে মালাবিতে ফিরে গেছে কিনা?' ইউনিফর্ম পরা অফিসার ল্যাণ্ডক্রুজারে তল্লাশি চালিয়ে সিধে হলো এইমাত্র।

চোখ গরম করে প্রতিবাদ জানাল অফিসার, সরকারী তথ্য ফাঁস করার নিয়ম নেই। পকেট থেকে মার্কিন দশ ডলারের একটা নোট বের করল রানা, চোখের সামনে তুলে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। এক সময় জাম্বিয়ান মুদ্রার মান ছিল মার্কিন ডলারের সমান। বহুবার অবমূল্যায়ন ও পুনর্মূল্যায়ন ঘটিয়ে সরকারী বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ৩০ঃ১। ব্ল্যাক মার্কেটে ৩০০ঃ১, বা কাছাকাছি। কাস্টমস অফিসার রানার হাতে তার এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা দেখতে পাচ্ছে।

'আপনার বন্ধুর নাম কি?' হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠল কাস্টমস অফিসার।

'মি. চাণার সিং। বড় একটা ট্রাক চালাচ্ছেন তিনি, শুকনো মাছ আছে ট্রাকে।'

'দাঁড়ান।' অফিসের ভেতর ঢুকল অফিসার, কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এসে বলল, 'হ্যাঁ, আপনার বন্ধু মাঝরাতের খানিক পর এখান দিয়ে গেছেন।' রানার পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে নিজের পোস্ট-এ ফিরে গেল সে।

বর্ডার পোস্ট পিছনে রেখে উত্তর অর্থাৎ লুসাকার দিকে যাচ্ছে রানা, বুকের ভেতর ঠাণ্ডা একটা অস্বস্তি। জাম্বিয়ায় আইন-শৃংখলা বলতে যে-টুকু অবশিষ্ট আছে তা শুধু শহরগুলোর সীমানার ভেতর। অথচ দেশটার বেশিরভাগ জায়গা এখনও জঙ্গল বা গ্রাম। রোড-ব্লকগুলোয় পুলিস আছে, কিন্তু নির্জন পথে বিপদে পড়লেও তারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। পুলিসের সম্পর্কে অভিযোগ আছে, একা কোন বিদেশীকে দেখলে চোর-ডাকাতদের সুযোগ নিতে দেয় না, নিজেরাই সব কেড়ে নেয়।

স্বাধীনতার পর পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেছে, মেরামতের অভাবে রাস্তাগুলোর অবস্থা করুণ। গর্তগুলো কোন কোন জায়গায় হাঁটু পর্যন্ত গভীর। ঘণ্টায় পঁচিশ মাইলের বেশি গাড়ি চালাতে পারছে না রানা।

দেশটা কিন্তু ভারি সুন্দর। পাতলা, প্রায় খোলা বনভূমির ভেতর দিয়ে চলে গেছে রাস্তাটা, ঢালগুলো ঢাকা পড়ে আছে সোনালি ঘাসে। পাহাড়গুলো যেন অলঙ্কার হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, বিভিন্ন চোখ জুড়ানো রঙ পাথরগুলোর, দেখে খুব দামী বলে মনে হয়, কেউ যেন মনের আনন্দে যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে। গভীর ও স্বচ্ছ সব ক'টা নদী।

প্রথম রোড-ব্লকে এসে থামল রানা।

ব্যারিয়ার একশো গজ দূরে থাকতেই ল্যাণ্ডক্রুজারের গতি কমিয়ে ফেলল ও, দুটো হাতই হুইলের ওপর রাখল, পুলিস যাতে দেখতে পায়। রোড-ব্লকের পুলিসরা কেন কে জানে সাংঘাতিক নার্ভাস থাকে, ভুল করে বা সন্দেহ করে গুলিবর্ষণ কোন দুর্লভ ঘটনা নয়। ল্যাণ্ডক্রুজার থামতেই একজন ইউনিফর্ম পরা কনস্টেবল, চোখে সানগ্লাস, জানালা দিয়ে সবমেশিনগান ঢুকিয়ে দিল। বলল, 'হ্যালো, মাই ফ্রেন্ড।' ট্রিগারে আঙুল, মাজল তাক করা হয়েছে রানার পেটে। 'গেট আউট!'

'তুমি সিগারেট খাও?' জানতে চাইল রানা। টয়োটা থেকে নামার সময় পকেট থেকে চেস্টারফিল্ডের একটা প্যাকেট বের করে গুঁজে দিল লোকটার হাতে।

মেশিন পিস্তলের ব্যারেল সরিয়ে নিল কনস্টেবল, পরীক্ষা করে দেখল প্যাকেটটা খোলা নয়। নিঃশব্দে হাসল সে, সামান্য ঢিল পড়ল রানার পেশীতে।

'লাইনে চলে যান,' হাত তুলে ট্রাক আর প্রাইভেট কারের লাইনটা দেখিয়ে দিল কনস্টেবল। 'এক ঘণ্টা পর তল্লাশি শুরু হবে।'

'এক ঘণ্টা পর কেন?'

'কোন প্রশ্ন নয়, আমাদের সময়মত আমরা তল্লাশি চালাব।'

মনে মনে প্রমাদ গুনল রানা। লুসাকা পর্যন্ত এরকম সাত-আটটা রোড-ব্লক আছে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুললে, এই সময় হৈ হৈ করে পৌঁছুল একদল স্থানীয় শিকারী। একটা হান্টিং সাফারি কোম্পানীর ট্রাক নিয়ে এল তারা, ট্রাকটা থামল ল্যান্ডক্রুজারের পিছনে। ট্রাকের পিছনে স্তূপ হয়ে আছে ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট, তার ওপর বসে আছে গানবেয়ারার আর ট্র্যাকাররা।

ড্রাইভিং সীটে বসে রয়েছে [illegible] এক পেশাদার শিকারী। আবলুসকাঠের মত কুচকুচে কালো, পরনে বাদামী সাফারি জ্যাকেট, মাথায় জেব্রার চামড়া দিয়ে তৈরি হ্যাট। 'মি. রানা!' জানালা দিয়ে মাথা বের করল সে। 'মি. মাসুদ রানা!' দু'কান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল তার হাসি।

এতক্ষণে লোকটাকে চিনতে পারল রানা। বছরখানেক আগের কথা, আফ্রিকার হান্টিং সাফারি সম্পর্কে একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করছিল ও–ম্যান ইজ দ্য হান্টার–তখন ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, নামটা মনে করতে পারল না রানা। তবে মনে পড়ল, দু'জন মিলে হেইগ-এর একটা বোতল সাবাড় করেছিল লুয়াঙ্গা উপত্যকায়, একটা ক্যাম্পফায়ারে। বোতলের বেশিরভাগই একা খেয়ে ফেলে সে, ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলে, 'আমার সুখ্যাতি যতটা না শিকারী হিসেবে, তারচেয়ে বেশি মদাপ হিসেবে।'

'ইসমাইল!' নামটা মনে পড়তে স্বস্তিবোধ করল রানা। একজন মিত্র এখন খুবই দরকার ওর। জাম্বিয়ায় সাফারি কোম্পানীর শিকারীদের অত্যন্ত দাম দেয়া হয়। 'বাবা ইসমাইল,' গলা চড়িয়ে জবাব দিল ও।

ট্রাক থেকে নামল মানুষ নয়, যেন একটা দৈত্য। 'হেল, ম্যান, ইট'স গুড টু সী ইউ এগেন।' লোমশ থাবা দিয়ে রানার হাত ঢেকে ফেলল সে। 'আপনার কোন অসুবিধে করছে এরা?' সরাসরি জানতে চাইল, এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সবই জানা তার।

'ইয়ে, মানে...,' কথাটা শেষ করল না রানা।

ঝট করে পুলিস কনস্টেবলের দিকে ফিরল বাবা ইসমাইল। 'ওহে, টিটো, এই ভদ্রলোক আমার বন্ধু। শুনলাম তুমি নাকি ওঁকে সমস্যায় ফেলতে চেষ্টা করছ? তারমানে তোমার আসলে মাংস দরকার নেই?'

এগিয়ে এসে রানাকে স্যালুট করল টিটো। আড়ষ্ট হেসে বলল, 'একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ঘটে গেছে, স্যার। আপনি যেহেতু জনাব বাবা ইসমাইলের বন্ধু, আপনার ট্রাক সার্চ করার কোন দরকারই নেই।'

'অ্যাই, দে তো, টিটোকে বড় দেখে একটা মোষের রান বের করে দে,' দরাজ গলায় নিজের লোকদের নির্দেশ দিল বাবা ইসমাইল। 'কোন দিকে যাচ্ছেন আপনি, মি. রানা?' জানতে চাইল সে। 'লুসাকা? আপনি বরং আগে থাকতে দিন আমাকে, তা না হলে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। লুসাকায় পৌঁছুতে সাতদিন বা অনন্তকাল লাগলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

তাড়াহুড়ো করে ব্যারিয়ার তুলে ফেলা হলো, আরেকবার স্যালুট করল পুলিস কনস্টেবল। প্রায় বিশ কেজি মাংস পেয়েছে সে। পরবর্তী রোড-ব্লকগুলোয় এমন খাতির করা হলো ওদেরকে, যেন রাজকীয় শোভাযাত্রা যাচ্ছে–প্রতিবার তারপুলিন

ঢাকা ট্রাক থেকে বেরিয়ে আসছে বড় আকারের মাংস খণ্ড।

অবশেষে লুসাকায় পৌঁছুল ওরা। অনুন্নত দেশগুলোর রাজধানীতে যা দেখা যায় এখানেও তা-ই দেখল রানা. কাজের সন্ধানে গ্রাম উজাড় করে শহরে চলে এসেছে মানুষ। রাজধানীর ঠিক বাইরে শুরু হয়েছে বস্তি এলাকা—দুর্গন্ধময় নর্দমা ও আবর্জনার স্তূপ. এই দুইয়ের মাঝখানে পাতা ও বাঁশ দিয়ে তৈরি হাত দুয়েক উঁচু কুঁড়েঘরের সারি, সামনে খেলা করছে হাড্ডিসার উলঙ্গ ছেলেমেয়েরা। পাশেই ড্রামে তৈরি হচ্ছে চোলাই মদ, আরেক পাশে জুয়ার আসর, চারপাশে ঘুরঘুর করছে নাবালিকা বেশ্যারা।

এরকম দৃশ্য, বলা উচিত এরচেয়েও ভয়ঙ্কর দৃশ্য, নিজের দেশেও দেখেছে রানা। নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করেছে ও, নিজের অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছে। এরকম একটা দৃশ্য, যারা দেখেনি, বললেও তারা বিশ্বাস করবে না। গোলাপ শাহ মাজারের সামনে সরকারী দল বিশাল মীটিং করছে, বিরোধী দলের জনসভা চলছে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ জুড়ে, আর মৌলবাদীরা জমায়েত হয়েছে শাপলা চত্বরে। গুলিস্তান সিনেমা হলের ঠিক উল্টোদিকে, আগে যেখানটায় মীর জুমলার কামান ছিল, তার মাত্র বিশ কি পঁচিশ গজ দূরে, চওড়া ও পাকা নর্দমার দু'দিকে পা রেখে প্রস্রাব করতে বসেছে তেরো কি চোদ্দ বছরের এক মেয়ে। জাঙ্গিয়াটা কোমর থেকে নামিয়ে পায়ের পাতার কাছে আনল, কোমরের ওপর তুলে ফেলল ছেঁড়া ও নোংরা ফ্রক, তারপর কোন রকম আড়াল না থাকা সত্ত্বেও বসে পড়ল। চারদিকে দুনিয়ার লোক, কেউ দেখল আবার কেউ দেখল না, তবে কারও কিছু এসে গেল বলে মনে হলো না। মেয়েটার চেহারায় কোমলতা বলে কিছু অবশিষ্ট নেই, দেখতেও সে কালো-খ্যাদা। তবে তার মুখে যে ভাবটা ছিল, এত বছর পর আজও সেটা পরিষ্কার মনে করতে পারে রানা। না, তার চেহারায় কোন লজ্জা ছিল না। এমনকি অশ্লীল হাসি বা নির্লজ্জ কৌতুকও ছিল না। মার খাওয়া কুকুরের মত সতর্ক দেখাচ্ছিল তাকে, যেন আবার কেউ মারতে এলেই খেঁকিয়ে উঠবে, প্রায় মারমুখো একটা ভাব।

কাজ সেরে মেয়েটা রাস্তা পেরোল, অপেক্ষারত তার অপর দুই সঙ্গিনীর সঙ্গে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে। ফুটপাতের পাশে, রেইলিঙে হেলান দিয়ে তখনও দাঁড়িয়ে রানা, তারপরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। স্বভাবতই কয়েকটা প্রশ্ন উঁকি দিয়ে যায় ওর সংবেদনশীল মনে। কেউ যদি দাবি করে, ওখানে ওরা যারা মীটিং বা সভা করছে তারা আসলে সবাই ব্যবসা মানেই বেশ্যাবৃত্তি ধরে নিয়ে রাজনীতিকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাহলে কি ভুল হবে? ওখানে যারা ভাষণ দিচ্ছে তারা পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে নিজেদেরকে বিশেষ একটা শ্রেণীতে তুলে ফেলেছে, নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে সমস্ত ক্ষমতা—ইতিহাস বলে না ওদের কারও কোন নাবালিকা মেয়ে রমনা বা ভিক্টোরিয়া পার্ক, কমলাপুর রেলস্টেশন বা সদরঘাট লঞ্চ টার্মিন্যালে খদ্দেরদের খোঁজে রাত কাটিয়েছে। তারা দেশের দূষিত বাতাস থেকে ছেলেমেয়েদের রক্ষার জন্যে বিদেশে রেখে লেখাপড়া শেখায়। কেউ যদি দাবি করে, গুলিস্তানের মোড়ে

প্রস্তাব করতে বসা কালো-খাঁদা মেয়েটার আচরণ আসলে একটা প্রতিবাদ? যদি বলা হয়, প্রস্তাবটা করা হয়েছে বিশেষ একটা শ্রেণীর মুখে? আমরা, যারা দেশটাকে জাহান্নাম বানাতে কমবেশি কিছু না কিছু অবদান রাখছি, দু' এক ফোঁটা তাদের মুখেও?

[illegible] হোটেলের বার। [illegible] ইনসাইডারকে [illegible] রানা। তার জন্যে চটজলদি অর্ডার দিয়ে রিসেপশন ডেস্কে চলে এল নাম লেখানোর জন্যে।

কামরাটা থেকে সুইমিং-পুল দেখা যায়। গত চব্বিশ ঘণ্টার ঘাম ও ক্লান্তি শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ধুয়ে ফেলল রানা। তরপর টেলিফোন তুলে ডায়াল করল ব্রিটিশ হাই কমিশন-এ। দিনের কাজ বন্ধ হয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে ওখানকার টেলিফোনিস্টকে ধরতে পারল ও। 'মি. মাইকেল ডাফ-এর সঙ্গে কথা বলতে পারি, প্লীজ?' জানতে চেয়ে দম বন্ধ করল ও। মাইকেল ডাফ দু'বছর আগে লুসাকায় ছিল, তবে ইতিমধ্যে অন্য কোথাও বদলি হয়ে যেতে পারে সে।

'মি. মাইকেল ডাফের সঙ্গে কথা বলুন, লাইন জুড়ে দিচ্ছি,' মেয়েটা কয়েক মুহূর্ত পর জবাব দিতে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা।

'মাইকেল ডাফ বলছি।'

'মাইক, আমি মাসুদ রানা।'

'গুড লর্ড, রানা, তুমি কোথায়?'

'এখানে, লুসাকায়।'

'রূপকথার রাজ্যে স্বাগতম, দোস্ত। আছ কেমন?'

'মাইক, তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে? আবার তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

'আজ রাতে আমাদের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছ না কেন? নোরাকে অন্তত মুগ্ধ হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত কোরো না।'

নবস হিল-এ, ডিপ্লোম্যাটিক জোনের একটা বাড়িতে থাকে মাইকেল ডাফ, গভর্নমেন্ট হাউস-এর কাছাকাছি। এলাকার অন্যান্য বাড়ির মতই ওটাকে দেখেও একটা দুর্গ বলে মনে হয়। দশ ফুট উঁচু পাঁচিলের মাথায় পাকানো কাঁটাতারের বেড়া, গেটে পাহারা দেয় দু'জন নাইটগার্ড।

একজোড়া বুলডগকে শান্ত করল মাইকেল ডাফ, তারপর কোলাকুলি করল রানার সঙ্গে।

'তুমি দেখছি কোন ঝুঁকি নিচ্ছ না,' সশস্ত্র গার্ডদের দিকে ইঙ্গিত করে বলল রানা।

'শুধু এই রাস্তাতেই প্রতি রাতে অন্তত একটা বাড়িতে চোর ঢোকে, কাঁটাতার ও কুকুর থাকা সত্ত্বেও।'

রানাকে নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল মাইকেল ডাফ, বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে ইংলিশ ঢঙে আলতোভাবে রানার গালে গাল ও ঠোঁট ঘষল নোরা। এটা তার কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ বলা যেতে পারে। নোরা একটা গোলাপ কুঁড়ি, মাথায়

কোমল কালো রেশম, গায়ের রঙ গাঢ় হলুদ। 'ভুলে গিয়েছিলাম যে টিভির চেয়ে রক্তমাংসের মাসুদ রানা আরও অনেক বেশি হ্যাণ্ডসাম।' রানার চোখে চোখ, হাসছে নোরা।

অক্সফোর্ড-এর একজন প্রফেসরের মত দেখতে হলেও, মাইকেল ডাফ আসলে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্ট ছিল। বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলোর মাধ্যমে পরিচয়, ওদের দু'জনকে তিনি একটা বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, আইআরএ সন্ত্রাসীদের আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করে মাইকেল ডাফ, কিন্তু সন্ত্রাসীদের হাতে ধরা পড়ে যায় নিজে। সে ওদের হাতে খুন হয়ে যাচ্ছে, এই সময় নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে রানা তাকে বাঁচায়। সেই থেকে ডাফ পরিবারের সঙ্গে রানার বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা। রানাকে কোনরকম সাহায্য করার সুযোগ পেলে বর্তে যায় মাইকেল। নোরার জীবনে স্বামীর চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই, কাজেই রানাকে এমন শ্রদ্ধা করে, ও যেন দেবদূত।

কুশলাদি বিনিময়ের পর কিচেনে চলে গেল নোরা, রানাকে নিয়ে সিটিংরুমে বসল মাইকেল ডাফ, ওর হাতে হুইস্কি ভরা একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল। পুরানো দিনের গল্প হলো কিছুক্ষণ, তারপর ডাইনিং রুম থেকে ওদেরকে ডিনার খেতে ডাকল নোরা। বাড়ির রান্না, কাজেই নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হলো রানার। ও খেতে খুব মজা পাচ্ছে দেখে আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল নোরার চেহারা।

ডিনার শেষে ব্র্যাণ্ডি নিয়ে বসল ওরা। মাইকেল ডাফ জানতে চাইল, 'কি সাহায্য দরকার তোমার, রানা?'

'বলা উচিত উপকার। তা-ও একটা নয়, দুটো।'

'বলে ফেলো, দোস্ত।'

'আমার ফিল্ম টেপ ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে ভরে লণ্ডনে পাঠানো সম্ভব হবে কি? আমার কাছে অত্যন্ত দামী জিনিস ওগুলো। জিম্বাবুই পোস্ট অফিসকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'কোন ব্যাপারই না।' মাথা ঝাঁকাল মাইকেল ডাফ। 'ওগুলো আমি কালকের ব্যাগে ভরে দেব। আর কি?'

'চণ্ডমণ্ড গণ্ড নামে এক ভদ্রলোক সম্পর্কে তথ্য দরকার আমার।'

'আমার তাঁকে চেনার কথা?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল ডাফ।

'চেনা উচিত। হারারেতে তাইওয়ানের অ্যামব্যাসাডর তিনি।'

'সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাঁর একটা ফাইল আছে আমাদের কাছে। তিনি শত্রু না বন্ধু, রানা?'

'ঠিক জানি না—অন্তত এই পর্যায়ে বলা যাচ্ছে না।'

'তাহলে শুনতে চাই না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রানার গ্লাসটা আবার ভরে দিল মাইকেল ডাফ। 'কাল দুপুরের আগেই তোমাকে একটা কমপিউটর প্রিন্ট-আউট দিতে পারব বলে আশা করি। তুমি চাও, ব্রিজওয়েতে পাঠিয়ে দিই?'

'ধন্যবাদ, মাইকেল। এই সব উপকার ঠেকায় পড়লে একদিন তুমি ফিরে দেয়ো।'

হেসে উঠল মাইকেল ডাফ, তারপর বলল, 'আবার তুমি আমার প্রাণ বাঁচানোর সুযোগ পাবে বলে মনে হয় না। কারণ আমি এসপিওনাজ জগৎ ছেড়ে দিয়েছি। এ-প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে মনে, জিজ্ঞেস করব, দোস্ত? ভাবছি তুমি আবার কিছু মনে করবে কিনা।'

'প্রশ্নটা না শুনে বলা যাচ্ছে না।'

'আমার মত তুমিও কি এসপিওনাজ জগৎ ত্যাগ করেছ?' মৃদুকণ্ঠে, যদিও প্রায় ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে, জানতে চাইল মাইকেল ডাফ। 'প্রশ্নটা করছি এই জন্যে যে আজ প্রায় এক বছর হলো, মাঝে দু'চার মাস বিরতি দিয়ে, আফ্রিকায় রয়েছ তুমি ছবি তোলার কাজ নিয়ে। ব্যাপারটা কি? কৌতূহলটা যদি অবাঞ্ছিত হয়ে থাকে, ক্ষমা চাই, দোস্ত।'

চিরতরুণ মাসুদ রানা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছে, জীবনানন্দ দাশ ও জসিমউদ্দিনের রোদনক্লিষ্ট বাংলা মায়ের এক দামাল সন্তান। ওর বুক জুড়ে দেশপ্রেম আর গোটা অস্তিত্ব জুড়ে রোমাঞ্চের নেশা। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনকে ব্রত হিসেবে নিয়ে সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায়। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম এজেন্ট রানা। দুনিয়ার যে-কোন দেশে, যে-কোন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে ও। ছদ্মবেশ ধারণের সমস্ত কৌশল ওর জানা। সব ক'টা মহাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় থাকায় যে-কোন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অনায়াসে এক হয়ে মিশে যেতে পারে। সৎ সাহস, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, মহত্ত্ব ও উদারতা ওর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এগুলো ওকে এসপিওনাজ জগতে কিংবদন্তীর নায়ক করে তুলেছে। বিসিআই ও মাসুদ রানা বাংলাদেশের জন্যে বয়ে এনেছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি। সিআইএ, কেজিবি ও বিএসএস ছাড়াও দুনিয়ার আরও অনেক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বিপদে-আপদে বিসিআই তথা মাসুদ রানার সাহায্য ও পরামর্শ চায়।

মাইকেল ডাফের কথা শুনে ক্ষীণ হাসল রানা, বলল, 'না, প্রশ্নই ওঠে না, এসপিওনাজ জগৎ ত্যাগ করিনি আমি। এমনকি হেডকোয়ার্টার থেকে আমাকে ছুটিও দেয়া হয়নি।'

'তাহলে?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মাইকেল ডাফ।

'তোমাকে বলতে আপত্তি নেই। পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, এ-দুটো বিষয়ে সচিত্র তথ্য সংগ্রহ করা আমার নতুন একটা শখ, এটা জানার পর আমার বস,' ওর বস মানে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, 'আমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে আফ্রিকায় পাঠিয়েছেন।'

'অ্যাসাইনমেন্ট?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল মাইকেল ডাফের। 'কি অ্যাসাইনমেন্ট?'

রানার চেহারা নির্লিপ্ত। 'পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, এ-দুটো সম্পর্কে সচিত্র তথ্য সংগ্রহ করার অ্যাসাইনমেন্ট।'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল মাইকেল ডাফ। 'কিন্তু এ-সবের সাথে এসপিওনাজের সম্পর্ক কি?'

'কোন সম্পর্ক নেই, আবার সব রকম সম্পর্ক আছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আফ্রিকায়। কারা নষ্ট করছে? কে দায়ী? তাদেরকে বাধা দেয়ার কি উপায়? এ-সব তথ্য সংগ্রহ করাও একজন এসপিওনাজ এজেন্টের দায়িত্ব বা কাজ হতে পারে, পারে না?'

'কি জানি।' তেমন উৎসাহ বোধ করছে না মাইকেল ডাফ। 'ইতিমধ্যে ঘাবড়ে যাবার মত কোন তথ্য পেয়েছ কি? কিংবা সন্ধান পেয়েছ মহাশক্তিশালী কোন শত্রুর, যে আফ্রিকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করার জন্যে দায়ী?'

'বসের ধারণা, আন্দাজ করতে পারি, এ-ধরনের দু'একজন মহা শক্তিশালী ভিলেনের দেখা আমি পেয়ে যাব। তুমি জানো না, আমার বস ভবিষ্যৎ দেখতে পান। তাঁর সন্দেহ বা ধারণা আগে কখনও মিথ্যে হতে দেখিনি। এবারও হয়তো সেরকম দু'একজন শত্রু আমি পেয়ে যাব।' একটু থেমে রানা আবার বলল, 'এ-প্রসঙ্গে তোমার আগ্রহ দেখছি না, কাজেই আলোচনাটা এখানেই ইতি হোক, কি বলো?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল মাইকেল ডাফ, তারপর বলল, 'তবে একটা কথা, কোন সাহায্য দরকার হলে আমাকে জানাতে ভুলো না।'

পল নিউম্যানের তোলা ফিল্ম টেপগুলো ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পেরে বিরাট স্বস্তিবোধ করল রানা। কাজটায় সময় লেগেছে ছ'মাসের বেশি, বিস্তর টাকাও খরচ হয়েছে। নতুন এই প্রজেক্টটার ওপর এত দৃঢ় ছিল ওর বিশ্বাস যে বাইরে থেকে আর্থিক সহায়তা পাবার কোন চেষ্টাই করেনি ও। ব্যাংকে যা কিছু জমা ছিল ওর, প্রায় পাঁচ লাখ মার্কিন ডলার, সব খরচ করে ফেলেছে। এই টাকাও অবশ্য বই লিখে ও টেলিভিশন প্রডিউসার হিসেবে কাজ করে আয় করেছে ও।

পরদিন সকালে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে ভরা রানার টেপ ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ফ্লাইটে চড়ে রওনা হয়ে গেল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে লণ্ডনে। নিজের স্টুডিওর ঠিকানায় পাঠিয়েছে রানা ওগুলো, ওখানেই সবচেয়ে নিরাপদ থাকবে। পরে সম্পাদনা করার জন্যে সময় বের করবে ও।

কোন বাহকের ওপর বিশ্বাস না রেখে, মাইকেল ডাফ নিজেই কমপিউটর প্রিন্ট-আউট দিয়ে গেল রানাকে ব্রিজওয়ে হোটেলে। 'টডমণ্ড গন্ড, ভাল এক লোককে বেছেছ হে,' মন্তব্য করল সে। 'সবটুকু আমি পড়িনি, তবে যে-টুকু পড়েছি তাতেই অন্তত এটুকু জ্ঞান হয়েছে যে গন্ড পরিবারের সঙ্গে কেউ যেন লাগতে না যায়। দূরে থাকার সুযোগ পেলে হাতছাড়া কোরো না, রানা। এক একটা বিষাক্ত সাপ।'

সীল করা এনভেলাপটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'শুধু একটা শর্ত, দোস্ত। পড়া হয়ে গেলেই পুড়িয়ে ফেলো। কথা দিতে হবে তোমাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে শর্তটা মেনে নিল রানা।

'হাই কমিশন থেকে তোমার জন্যে একজন গার্ড নিয়ে এসেছি আমি,' বলল

মাইকেল ডাক। 'তোমার জন্যে নয়, তোমার ল্যাণ্ডক্রুজারের জন্যে। দুসাকায় কেউ তার গাড়ি রাস্তায় ফেলে রাখার মত বোকামি করে না।'

এনভেলাপটা নিয়ে ওপরতলায়, নিজের স্যুইটে চলে এল রানা, ফোনের রিসিভার তুলে চা চাইল। রুম-সার্ভিস চা দিয়ে যাবার পর দরজায় তালা লাগাল ও, কাপড়চোপড় খুলে উঠে পড়ল বিছানায়। বুকে বালিশ নিয়ে উপুড় হলো ও, পড়তে শুরু করল অ্যামব্যাসেডরের [illegible] গণ্ডের ডোশিয়ে।

এগারো পাতার প্রিন্ট-আউট, প্রতিটি পাতায় বিস্ময়কর সব তথ্য। গণ্ড পরিবারের ধন-সম্পদ ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলি শাহ রানাকে সামান্য একটু আভাস দিয়েছিল মাত্র।

পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হলেন চণ্ডকিশু গণ্ড। পৃথিবীর এমন কোন দেশ খুব কমই আছে যেখানে তাঁর বিপুল স্থাবর সম্পত্তি নেই। সবই তাঁর নিজের নামে। আন্তর্জাতিক অসংখ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগ শেয়ার কেনা আছে তাঁর। লুক্সেমবার্গ, জেনেভা, টোকিও, নিউ জার্সি, ক্যালিফোর্নিয়া, জোহানেসবার্গ, এরকম বহু শহরের নাম উল্লেখ করার পর রিপোর্টের লেখক হাল ছেড়ে দিয়ে লিখেছে, তালিকাটা অসম্পূর্ণ—এ-সব শহরে ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ভূ-সম্পত্তি আছে তাঁর।

তথ্যগুলোর ওপর আরও বেশি খেয়াল দেয়ার পর রানার মনে হলো, চণ্ডমণ্ড গণ্ড আফ্রিকায় অ্যামব্যাসাডর হবার পর থেকে গণ্ড পরিবারের পুঁজি বিনিয়োগ হকে সূক্ষ্ম পরিবর্তন দেখা দেয়। ওদের বেশিরভাগ হোল্ডিং প্যাসিফিক রিম-এর চারধারে যেমন ছিল তেমনি আছে এখনও, তবে আফ্রিকায় ও আফ্রিকা-কেন্দ্রিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ওদের পুঁজি বিনিয়োগ অনেকগুণ বেড়ে গেছে।

পাতা উল্টে রানা আবিষ্কার করল, কমপিউটারও ব্যাপারটা ধরতে পেরে একটা হিসাব বের করেছে—ছ'মাস সময়সীমার মধ্যে শূন্য থেকে সমুদয় পুঁজির শতকরা বারো ভাগ আফ্রিকা সেকশনে বিনিয়োগ করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অসংখ্য পাহাড় নিয়ে গঠিত মাইনিং হোল্ডিং, আফ্রিকার বিভিন্ন বড় আকারের ফুড প্রডাকশন কোম্পানীর সর্ববৃহৎ শেয়ার, বনবিভাগের বিশাল সব এলাকা, পাম্প মিল, শীপ র‍্যাঞ্চ, একের পর এক কিনে নিয়েছে ওরা—সবই আফ্রিকায়, সাহারার দক্ষিণে। বোঝা যায়, গণ্ড পরিবারের নজর পড়েছে এখানে।

কমপিউটার প্রিন্ট-আউটের চার নম্বর পাতায় দেখা গেল, চণ্ডমণ্ড গণ্ড আরেক ধনকুবের তাইওয়ানিজ পরিবারের এক মেয়েকে বিয়ে করেছে। প্রেমের পরিণতি নয়, পারিবারিক উদ্যোগে হয় বিয়েটা। দুটো বাচ্চা ওদের—উনিশশো বিরাশি সালে জন্ম হয় ছেলেটার, এক বছর পর মেয়েটার।

চণ্ডমণ্ড গণ্ডের আগ্রহ ও দুর্বলতার একটা তালিকা দেয়া হয়েছে। প্রাচ্য দেশীয় গান-বাজনা, থিয়েটার, এশিয়ার চিত্রকর্ম আর বিশেষ করে আইভরির তৈরি দুর্লভ অলঙ্কার বা শিল্পকর্ম তাঁর বিশেষ পছন্দ। গলফ খেলেন তিনি, টেনিস খেলেন, ইয়ট নিয়ে সাগরে বেড়াতে ভালবাসেন। মার্শাল আর্টে তিনি একজন এক্সপার্ট। ধূমপান খুব কমই করেন, মদ খান সামাজিক অনুষ্ঠানে। জানামতে তিনি কোন নারকোটিক ব্যবহার করেন না। রিপোর্টে তাঁর একটাই

দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, তার এই দুর্বলতা তাকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাইপের প্রথম শ্রেণীর ব্রোথেলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, নিয়মিত। তাঁর যৌন রুচি স্যাডিস্টিক ধরনের। উনিশশো সাতাশি সালে তাঁর যৌন আচরণের শিকার হয়ে ব্রোথেলের এক মেয়ে মারা যায়। কেলেঙ্কারি ও অপরাধ চাপা দিতে গণ্ড পরিবারের কোন সমস্যা হয়নি, বোঝা যায় চণ্ডমণ্ডের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের না করা থেকে।

মাইকেল ঠিকই বলেছে, প্রিন্ট-আউট একপাশে সরিয়ে রেখে ভাবল রানা। চণ্ডমণ্ড গণ্ড বিষাক্ত সাপই বটে, বাসও করছে নিরাপদ একটা দুর্গে। নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা, তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না। প্রতিবার এগোতে হবে এক পা করে।

প্রথমে চাখার সিং। যোগাযোগটা প্রমাণ করতে হবে ওকে। চাখার সিং-এর সঙ্গে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের সম্পর্ক আছে, এটা জানা গেলে দ্বিতীয় কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে ওর জন্যে।

ডিনারের জন্যে কাপড় পরছে রানা, ড্রেসিং টেবিলে রেখে প্রিন্ট-আউটের পাতা ওল্টাচ্ছে, নিশ্চিত হতে চায় এমন কোন তথ্য ওর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে কিনা যা থেকে বোঝা যাবে গণ্ড পরিবারের সঙ্গে মালাবি বা চাখার সিং-এর যোগাযোগ আছে।

না, নেই।

হতাশ মন নিয়ে ডিনার খেতে নামল রানা। আলি শাহ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে হবে ওকে, কিন্তু হাতে প্রমাণ ও সূত্র না থাকলে কিভাবে তা সম্ভব?

পাঁচ পাতার মেনু, স্মোকড স্কচ স্যামন থেকে শুরু করে সারলয়ন রোস্ট, সবই আছে। কিন্তু এ-দুটো অর্ডার দিতে মাথা নাড়ল ওয়েটার। সে তার নিজস্ব ইংরেজিতে বলল, 'সরি, নো গট।'

ব্যাপারটা দ্রুত একটা খেলা হয়ে উঠল। মেনুর যে আইটেমের ওপরই আঙুল রাখে রানা, দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ে ওয়েটার। 'নো গট।'

তারপর রানা লক্ষ করল, ডাইনিং রুমে সবাই ঝোলসমেত চিকেন রোস্ট আর ভাত খাচ্ছে।

'ইয়েস, গট চিকেন রোস্ট অ্যাণ্ড রাইস।' অনুমোদনের ভঙ্গিতে ঘন'ঘন মাথা কাত করল ওয়েটার। 'হোয়াট ইউ ওয়ান্ট ফর ডেজার্ট, স্যার?'

ইতিমধ্যে কৌশলটা শিখে ফেলেছে রানা। আশপাশের টেবিলগুলো দেখে নিল ও। 'হাউ অ্যাবাউট ব্যানানা ক্যাস্টারড?'

মাথা নাড়ল ওয়েটার। 'নো গট।' তবে তার চেহারা দেখে রানার মনে হলো, লোকটা উৎসাহবোধ করছে।

টেবিল ছেড়ে দাঁড়াল রানা, পাশের টেবিলে এসে নাইজেরিয়ান ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে বলল, 'এক্সকিউজ মি, স্যার, কি খাচ্ছেন আপনি?'

নিজের টেবিলে ফিরে এল রানা। 'ব্যানানা ডিলাইট দিতে পারো আমাকে,' বলল ও, খুশিতে মাথা ঝাঁকাল ওয়েটার।

'ইয়েস, টুনাইট গট ব্যানানা ডিলাইট।'

বিব্রত ওয়েটারের চাতুরি ও ভান রানার হাসিখুশি মেজাজটা ফিরিয়ে আনল। 'এতব্লিউএ,' তাকে বলল ও। 'আফ্রিকা উইনস এগেইন।' বহুল প্রচলিত প্রশংসো বাক্যটি শুনে ওয়েটারের মুখে হাসি আর ধরে না।

পরদিন সকালে পুব অর্থাৎ টিপাটা ও মালাবি সীমান্তের দিকে রওনা হলো রানা। হোটেলটা থেকে লোভনীয় ব্রেকফাস্ট আশা করার কোন মানে হয় না, আর রান্নাঘর কিচেন খোলার অনেক আগেই বেরিয়ে পড়েছে ও। সূর্য উঠল প্রায় একশো মাইল পেরিয়ে আসার পর। সারাটা দিনই চলার মধ্যে থাকল ও, রাস্তার পাশে থামল শুধু খাবার জন্যে।

পরদিন সকালে সীমান্তে পৌঁছুল রানা, মালাবিতে ঢুকল দারুণ উৎসাহ নিয়ে। সদ্য ত্যাগ করে আসা দেশটার চেয়ে মালাবি যে শুধু দেখতে সুন্দর তা নয়, তুলনায় এখানকার মানুষ অনেক বেশি তৃপ্ত ও প্রাণচঞ্চল।

মালাবিকে তার বিশাল সব পাহাড়, উঁচু মালভূমি, পান্না সবুজ লেক আর স্রোতস্বিনী নদীর জন্যে আফ্রিকার সুইটজারল্যাণ্ড বলা হয়। মহাদেশের পুরোটা দক্ষিণ জুড়ে মালাবিয়ানদের প্রশংসা করা হয় খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্যে। বাড়ির চাকরবাকর থেকে শুরু করে মাইনার বা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার হিসেবে ওদের বিপুল চাহিদা। উত্তোলনযোগ্য খনিজ ভাণ্ডারের অভাব মালাবি পুষিয়ে নিচ্ছে তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ জনবল রফতানি করে।

অশীতিপর স্বৈরাচারী বৃদ্ধ নিজেকে আজীবন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন, ফলে একটা দিকে লাভ হয়েছে মালাবির–রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই বললেই চলে। যোগ্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব, কাজেই মন দিয়ে ও দয়া-ধর্ম বজায় রেখে দেশ চালাচ্ছেন তিনি। তাঁর আমলে যুব-সম্প্রদায়কে সুযোগ দেয়া হয়েছে প্রতিভা বিকাশের। গ্রাম্য এলাকাকে অবহেলা করা হয় না, গ্রাম ত্যাগ করে শহরে আসার প্রবণতাও রোধ করা গেছে। রাস্তার ধারে লোকজন সুবেশী, স্বাস্থ্যবান ও হাসিখুশি। নেতার নির্দেশ, প্রতিটি পরিবারকে নিজেদের জন্যে বাড়ি বানাতে হবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে খাদ্য উৎপাদনে। ফসল হিসেবে তুলো আর বাদাম ফলায় ওরা। বড়সড় পাহাড়ী এস্টেটগুলোয় অতি উন্নতমানের চা পাতার চাষ করে।

রাজধানী লিলঙ্গুয়ের দিকে যতই এগোল রানা ততই মুগ্ধ হলো ও। প্রতিটি গ্রাম পরিচ্ছন্ন, সাজানো ছবির মত, প্রাচুর্যের না হলেও সচ্ছলতার চিহ্ন আনাচে-কানাচে। সুন্দরী মেয়ে ও মহিলারা বেশিরভাগই হাঁটু ঢাকা স্কার্ট পরে আছে, বহুরঙে রাঙানো এবং প্রেসিডেন্টের ছবি ছাপা। আইন জারি করে ছোট স্কার্ট পরা নিষিদ্ধ করেছেন হেস্টিংস বান্দা। পুরুষদের লম্বা চুল রাখার বিরুদ্ধেও আইন আছে।

রাস্তার ধারে খাবারদাবার আর কাঠের মূর্তি বিক্রি হচ্ছে। ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগে, আফ্রিকার কোন রাষ্ট্রে বাড়তি খাবার আছে। ডিম, কমলা, জবাই করা হাঁস, রসালো টমেটো আর বাদাম কেনার জন্যে টয়োটা থামাল রানা, হকারদের সঙ্গে

রসিক-রস বিনিময়ের একটা সুযোগও পাওয়া গেল।

এক সঙ্গে এত সুখী মুখ দেখে রানার সমগ্র অস্তিত্বে ভাল লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। সুখী জীবন গড়ার একটা সুযোগ পাও, আফ্রিকার মত সদয়, সরল, হাসিখুশি ও প্রাণচঞ্চল মানুষ দুনিয়ার খুব কম জায়গাতেই পাবে [illegible]

ঠিক প্রাণচঞ্চল বা কর্মচঞ্চল হয়তো নয়। কেন নয় তা হয়তো বলতে পারবেন সমাজবিজ্ঞানীরা। কে জানে, হয়তো জলবায়ু দায়ী—মানুষকে অলস করে রাখার উপাদান আছে। তবে দুঃখজনক সত্যি হলো, সুখী জীবন গড়ার সুযোগ কোনদিনই পায়নি তারা। সোনার বাংলা বলা হয় বটে, আসলে নিজেদেরকে ফাঁকি দেয়ার জন্যেই বলা। সোনার সঙ্গে তুলনা করার মত চেহারা কোনদিনই ছিল না বাংলার। রানার অন্তত তাই ধারণা।

রাজধানী লিলঙ্গুয়ে কিছুকাল আগে তৈরি করা হয়েছে। কোথাও বস্তির চিহ্নমাত্র নেই। আধুনিক ও সুশৃঙ্খল শহর বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। বছর কয়েক আগে একবার এসেছিল রানা, তখন এতটা সুন্দর লাগেনি। ক্যাপিটাল হোটেলটা শহরের মাঝখান থেকে খুব একটা দূরে নয়, নিজের কামরায় একা হতেই বেডসাইড টেবিলের দেরাজ থেকে লোকাল টেলিফোন গাইড বের করে পাতা ওল্টাল ও।

চাখার সিং শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক, বোঝা গেল সে তার নাম ফাটাতে পছন্দ করে। তালিকায় দেখা যাচ্ছে অসংখ্য ফোন নম্বর তার। প্রতিটি ঘি ও মধুর পাত্রে আঙুল ডুবিয়ে রেখেছে লোকটা। তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামগুলো পড়তে শুরু করল রানা। চাখার সিং ফিশারিজ, চাখার সিং সুপারমার্কেট, চাখার সিং ট্যানারি, চাখার সিং স মিল, চাখার সিং গ্যারেজ অ্যাণ্ড টয়োটা এজেন্সি—এর যেন কোন শেষ নেই; প্রায় পুরো একটা পাতা ভরা তালিকা।

এরকম একটা চিড়িয়াকে খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়, মনে মনে স্বীকার করল রানা। এখন দেখতে হবে নিজের চারধারে পরিবেশটা কেমন তৈরি করে রেখেছে সে।

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাচ্ছে ও, লণ্ড্রি থেকে ওর কাপড়চোপড় নিয়ে এল রুম-সার্ভিস। খুশি হলো রানা, বুশ জ্যাকেটটা কড়া মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করা হয়েছে।

নিচে নেমে এসে রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞেস করল ও, 'চাখার সিং-এর সুপারমার্কেটটা কোন দিকে?'

'পার্ক ছাড়িয়ে,' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল লোকটা।

পার্কের ভেতর দিয়ে ট্রাক চালাচ্ছে রানা। আশপাশের লোকজন লক্ষ করছে ওকে। কারণ হলো নতুন সেলাই করা বুশ জ্যাকেট, সিল্ক স্কার্ফ, ধুলোয় ঢাকা ও তোবড়ানো টয়োটা—মাসুদ রানা প্রডাকশনের লোগো। রানা ভাবছে, ওকে বা ওর ল্যাণ্ডক্রুজারকে দেখামাত্র চাখার সিং চিনতে পারবে কিনা। সময়টা ছিল রাত, সম্ভবত ভাল করে দেখার সুযোগ পায়নি।

রাস্তাটার নামই মেইন স্ট্রীট, তারই পাশে চারতলা বিল্ডিঙে চাখার সিং-এর সুপারমার্কেট। আধুনিক ভবন, মোজাইক করা পরিচ্ছন্ন মেঝে ও দেয়াল।

শেলফগুলোয় স্তূপ হয়ে আছে জিনিস-পত্র, প্রতিটির গায়ে মুদ্রিত দাম লেখা। গোটা সুপার মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করছে যন্ত্র। আফ্রিকায় সাধারণত এ-ধরনের দৃশ্য দেখা যায় না।

গৃহবধূরা শপিং ট্রলি ঠেলে এগোচ্ছে, মিছিলে সামিল হলো রানা। বিভিন্ন আর কাস্টমারের লক্ষ করছে ও। খদ্দেরদের বেরিয়ে যাবার পথে ক্যাশ রেজিস্টার, [illegible]

হলো। কাউন্টারের দেরাজ খুললে বা বন্ধ করলে মিষ্টি [illegible] সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে আরও মিষ্টি চারবোনের কলকণ্ঠ। ওদের চেহারাই রানাকে আন্দাজ করতে সাহায্য করল, পরস্পরের বোন ওরা। পরস্পরের বোন এবং চাখার সিং-এর মেয়ে। সম্ভবত। সবাই তারা রঙচঙে শাড়ি পরে, কেউ কারও চেয়ে কম সুন্দর নয়।

বিশাল মেঝের মাঝখানে আরেক এশিয়ান মহিলা, মধ্যবয়স্কা, লম্বা এক মঞ্চে বসে আছে, ওখান থেকে দোকানটার প্রতিটি কোণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। তার চুলের রঙ খয়েরি, বিনুনি করা। পরনের শাড়িটা হালকা রঙের, সোনালি পাড়। মোট আঙুলে আটটা আঙটি, প্রতিটিতে হীরে বসানো।

চাখার সিং-এর স্ত্রী, সিদ্ধান্ত নিল রানা। নগদ টাকা নাড়াচাড়া করার ব্যাপারে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা পরিবারের বাইরের কাউকে সহজে সুযোগ দিতে চায় না, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ব্যবসা করতে গিয়ে বোধহয় সেজন্যেই তারা সফল হয়। যথেষ্ট সময় নিয়ে এটা-সেটা কিনল রানা, আশা করল শিকারকে এক পলকের জন্যে হলেও দেখতে পাবে, কিন্তু পাগড়ি পরা চাখার সিং-এর ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না কোথাও।

অবশেষে মঞ্চ ছেড়ে উঠল চাখার সিং-এর স্ত্রী। ওঠার পর বোঝা গেল, তাকে হস্তিনীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। দেহটা প্রকাণ্ড হলেও, মহিলার হাঁটার মধ্যে শান্ত আভিজাত্য ও গাম্ভীর্য আছে, স্বীকার করতে হবে। দোকানের অপর প্রান্তে হেঁটে গেল সে, তারপর ফুড হল-এর আড়ালে লুকিয়ে থাকা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। সিঁড়িটা এক কোণে, আগে রানার চোখেই পড়েনি।

ধাপগুলো টপকে একটা দরজার ভেতর ঢুকল মহিলা। উঁচু দরজাটার পাশে একটা আয়না লাগানো জানালা লক্ষ করল রানা। দোলাই যায়, ওখান-এরে ওরা দরজার পিছনের কামরা থেকে সুপারমার্কেটের সবটুকু পরিষ্কার দেখা যায়। কামরাটা যে চাখার সিং-এর অফিস, এ-ব্যাপারে রানার মনে কোন সন্দেহ নেই।

আয়না লাগানো জানালার দিকে পিছন ফিরল রানা। এমন হতে পারে, দোকানে ঢুকে মানুষটা ধরেই নজর রাখা হচ্ছে ওর ওপর। এখন সাবধান হওয়া না হওয়া সমান, অনেক দেরি হয়ে গেছে। ক্যাশ রেজিস্টার-এর দিকে এগোল রানা, দাম একটা মেয়ের সামনে হাত দিতে হবে ওকে হিসাব করছে মেয়েটা, পিছনের দেয়ালে আয়না লাগানো জানালার দিকে ভুলেও রানা তাকাচ্ছে না।

জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে চাখার সিং, কামরায় ঢুকল তার স্ত্রী। একেবারে

তাকিয়েই বুঝতে পারল মহিলা, তার স্বামী উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। সরু হয়ে উঠেছে চোখ দুটো, মুঠোয় নিয়ে টানাটানি করছে দাড়ি।

'বুশ জ্যাকেট পরা ওই লোকটাকে,' জানালার নিচে মোজাইক করা মেঝের দিকটা ইঙ্গিতে দেখাল চাখার সিং, 'লক্ষ করেছ তুমি?'

'হ্যাঁ।' স্বামীর পাশে চলে এল মহিলা। 'ঢোকার সময়ই লক্ষ করেছি। ভারতীয় বলেই মনে হলো। চুল আর হাঁটাচলা দেখে সন্দেহ হয় পুলিস বা মিলিটারি, তাই না?'

'কেন, তোমার এরকম সন্দেহ হলো কেন?'

'কেন আবার!' হাত দুটো উঁচু করে নাচাল মহিলা। দেহটা স্থূল হলেও, হাত দুটো ভারি সুন্দর তার, আঙুল নাচানোর ভঙ্গিটা আরও সুন্দর ও অভিজাত। তরুণী যে মেয়েটাকে ত্রিশ বছর আগে বিয়ে করেছিল চাখার সিং, এ হাত দুটো তারই। তালু আর আঙুলে মেহেদির লাল রঙ। 'দাঁড়ানোর স্বচ্ছ ভঙ্গি দেখে। হাঁটার ধরনটা...গর্বিত। ঠিক যেন একজন সৈনিক।'

'ওকে বোধহয় চিনি আমি,' বলল চাখার সিং। 'অল্প ক'দিন আগে দেখেছি, কিন্তু রাতে দেখায় ঠিক নিশ্চিত হতে পারছি না।' ডেস্ক থেকে ফোনের রিসিভার তুলে দুটো সংখ্যা ডায়াল করল সে।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, তার মেজো মেয়ে রিসিভার তুলল।

'সোনা,' হিন্দীতে কথা বলছে চাখার সিং। 'তোমার সামনে যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। উনি কি দাম মেটাচ্ছেন ক্রেডিট কার্ড দিয়ে?'

'হ্যাঁ, বাবা।' সবগুলো মেয়ের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে বুদ্ধিমতী, তাকে প্রায় পুত্রসন্তান হিসেবে মূল্য দেয় চাখার সিং।

'ওঁর নামটা জেনে নাও, জিজ্ঞেস করো শহরে কোথায় উঠেছেন।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল চাখার সিং, দেখল একগাদা জিনিস-পত্র নিয়ে সুপারমার্কেট থেকে বেরিয়ে গেল রানা। ও চলে যেতেই আবার রিসিভার তুলে ডায়াল করল সে।

'ভদ্রলোকের নাম মাসুদ রানা,' মেয়ে তাকে জানাল। 'বললেন ক্যাপিটাল হোটেলে উঠেছেন।'

'গুড। চেরিসকে ডাকো, জলদি।'

চেয়ারের ওপর দ্রুত ঘুরে বসল মেয়ে, প্রধান গেটে দাঁড়ানো ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটি গার্ডদের একজনকে ডাকল। ফোনের রিসিভারটা নিয়ে কানে ঠেকাল চেরিস।

'চেরিস, এইমাত্র যে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন, ওকে তুমি চিনতে পেরেছ? লম্বা, ব্যাকব্রাশ করা চুল?' অ্যাঙ্গোলি ভাষায় জিজ্ঞেস করল চাখার সিং।

'দেখেছি, বস,' একই ভাষায় জবাব দিল চেরিস। 'কিন্তু কে, চিনলাম না তো।'

'চার রাত আগে,' মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল চাখার সিং। 'চিরুণ্ডুর কাছাকাছি রাস্তার ওপর আমরা ট্রাক লোড করার পরপরই। গাড়ি থামিয়ে কথা বললেন আমাদের সঙ্গে। মনে পড়ে?'

প্রশ্নটা নিয়ে ভাবছে চেরিস, চাখার সিং দেখল নাকে আঙুল ঢুকিয়ে ময়লা পরিষ্কার করছে সে—অস্বস্তি ও বিব্রত বোধ করার লক্ষণ। 'হয়তো,' অবশেষে বলল চেরিস। 'ঠিক মনে পড়ছে না।' নাকের ফুটো থেকে বের করে আঙুলটা চোখের সামনে তুলে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। অ্যাঙ্গোনি সম্প্রদায়ের লোক সে, তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজবংশ জুলুদের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়তা আছে। রাজা চাকা-র আমলে, যার শুরু বহু আগে, এতটা উত্তরে চলে আসে ওরা। সে একজন যোদ্ধা, মাথা ঘামানো বা বুদ্ধির চর্চা তার দ্বারা সম্ভব নয়।

'পিছু নাও,' নির্দেশ দিল চাখার সিং। 'সাবধান, তোমাকে যেন দেখতে না পায়। কি বললাম?'

'পিছু নেব, বস্।' হুকুম পেয়ে স্বস্তিবোধ করল চেরিস, লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল সুপারমার্কেট থেকে।

আধঘন্টা পর ফিরল চেরিস, ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত কলেবর। তাকে প্রধান গেট দিয়ে ঢুকতে দেখেই মেজ মেয়েকে ফোন করল চাখার সিং। 'চেরিসকে এখুনি আমার অফিসে পাঠিয়ে দাও।'

সিঁড়ির মাথায়, দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল যেন একটা দৈত্য।

চাখার সিং কর্কশ গলায় প্রশ্ন করল, 'পিছু নিয়েছিলে?'

'বস্, এ সে-ই লোকই।' হাত দুটোকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে চেরিসের, কোথায় রাখবে বুঝতে পারছে না—একবার শরীরে পাশে ঝুলিয়ে দিচ্ছে, পরক্ষণে তুলে আনছে বুকের ওপর। শরীরটা প্রকাণ্ড হলে কি হবে, চাখার সিংকে সাংঘাতিক ভয় করে সে। বসকে অসন্তুষ্ট করার ফলে কার কপালে কি ঘটেছে সবই তার জানা। বসের জারি করা নিয়ম ও শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্ব সাধারণত তাকেই পালন করতে হয়। কথা বলার সময় বসের চোখে তাকাল না সে। 'সেদিন রাতে এই লোকই আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিল, বস্,' বলল সে।

ভুরু কুঁচকে চাখার সিং জানতে চাইল, 'খানিক আগে চিনতে পারোনি, এখন বলছ পেরেছ—কারণ?'

'ট্রাকটা দেখে,' ব্যাখ্যা করল চেরিস। 'এখান থেকে কেনা জিনিসপত্রগুলো ট্রাকে তুলল সে। সেই ট্রাকটাই, গায়ে মানুষের হাত আঁকা।'

'গুড।' অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল চাখার সিং। 'ভাল কাজ দেখিয়েছ। ভদ্রলোক এখন কোথায়?'

'ট্রাক নিয়ে চলে গেল, বস্।' মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে হাতজোড় করে, মাথা নাড়ল চেরিস। 'আমি তার পিছু নিতে পারিনি। আমার দোষ হয়েছে, বস্।'

'নেভার মাইণ্ড। যথেষ্ট করেছ তুমি।' এক সেকেণ্ড চিন্তা করল চাখার সিং। 'আজ রাতে ওয়্যারহাউসে কার ডিউটি?'

'আমার, বস্…,' হঠাৎ উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেরিসের চেহারা। তার দাঁতগুলো কোদাল আকৃতির, প্রতিটি একই মাপের, ধবধবে সাদা। 'আমার আর চণ্ডীর, বস্।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' দাঁড়াল চাখার সিং। 'দোকান বন্ধ হবার পর আজ সন্ধ্যায় ওয়্যারহাউসে আসছি আমি। নিশ্চিত হতে চাই চণ্ডী তার কাজ করার জন্যে তৈরি

থাকবে। আমি দেখতে চাই সমস্ত আয়োজন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ছোট খাঁচায় ভরে রাখো চণ্ডীকে। কোন ভুল বা গাফলতি আমি মানব না। কি বললাম, চেরিস?'

চাখার সিং-এর কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল চেরিস, বলল, 'সব পরিষ্কার, বস্।'

'ডিটেইল সময়, ওয়ার্কআউটস,' আবার একবার মনে করিয়ে দিল চাখার সিং, চেরিসের বেলায় তার দরকার আছে।

'জ্বী, বস্।' মাথা নিচু করে দোরগোড়া থেকে সরে গেল চেরিস, সরাসরি বসের দিকে একবারও তাকায়নি সে।

চেরিস চলে যাবার পর দীর্ঘ কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকল চাখার সিং, বন্ধ দরজার ওপর স্থির হয়ে আছে দৃষ্টি। তারপর ফোনের রিসিভার তুলল।

আন্তর্জাতিক একচেঞ্জে সরাসরি ডায়াল করে লাইন পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার আফ্রিকায়। জিম্বাবুইকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রই বলা যায়, শুধু মোজাম্বিকের সরু টেইট করিডর আলাদা করে রেখেছে। তাসত্ত্বেও বিশ মিনিট ধরে পাঁচ-সাতবার চেষ্টা করার পর অপরপ্রান্তে রিঙ হবার শব্দ শুনতে পেল সে, তারপর হারারের নম্বর পেল।

'গুড আফটারনুন। এটা রিপাবলিক অভ তাইওয়ান-এর দূতাবাস।'

'আমি কি মহামান্য অ্যামব্যাসাডরের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'দুঃখিত। হিজ এক্সেলেন্সীকে এই মুহূর্তে পাওয়া যাবে না। আপনি কি আমাকে কোন মেসেজ দেবেন, কিংবা অন্য কোন স্টাফের সঙ্গে কথা বলবেন?'

'আমি চাখার সিং কথা বলছি। আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'প্লীজ, অপেক্ষা করুন, স্যার।'

এক মিনিট পর অ্যামব্যাসাডর চঙমঙ গঙ লাইনে এলেন। 'এই নম্বরে আপনি ফোন করবেন না। এ-ব্যাপারে আগেই আমাদের কথা হয়েছে।'

চাখার সিং দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'ব্যাপারটা জরুরী। সাংঘাতিক!'

'এ-লাইনে কথা বলা সম্ভব নয়। এক ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে আমি রিঙ করব। আপনার নম্বর দিন, তারপর অপেক্ষা করুন।'

চাখার সিং-এর ডেস্কে প্রাইভেট ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল চল্লিশ মিনিট পর। এই ফোনের নম্বর তালিকায় নেই।

'এটা নিরাপদ লাইন,' চাখার সিংকে বললেন চঙমঙ গঙ। 'তবু সাবধানে কথা বলবেন।'

'মাসুদ রানা নামে কাউকে চেনেন আপনি?' সরাসরি প্রসঙ্গে চলে এল চাখার সিং।

'মাসুদ রানা? হ্যাঁ, চিনি।'

'এই ভদ্রলোকের সঙ্গেই চিউইউইয়ে দেখা হয়েছিল আপনার, তাই না? রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইনিই তো অভিযোগ করেছিলেন যে আপনার কাপড়ে বিশেষ একটা দাগ দেখা যাচ্ছে, কি?'

'হ্যাঁ।' ভাবাবেগ বর্জিত কণ্ঠস্বর চঙমঙ গঙের। 'চিন্তা করবেন না, চিন্তা করার

কিছু নেই। তিনি কিছু জানেন না।'

'যদি না-ই জানেন, লিলঙ্গুয়েতে কেন আসবেন?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল চাখার সিং। 'এখনও আপনি আমাকে চিন্তা করতে বারণ করবেন?'

অপরপ্রান্তে কয়েক সেকেণ্ড কোন শব্দ নেই। 'লিলঙ্গুয়েতে?' অবশেষে জিজ্ঞেস করলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'উনি কি চিরুণ্ডু রোডে আপনাকেও সেদিন দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ।' দাড়ি ধরে টানল চাখার সিং। 'থেমে আমার সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। জানতে চাইলেন, পার্কের ট্রাকগুলোকে আমি দেখেছি কিনা।'

'কখন? আইভরিগুলো আমরা আপনার কাছে ট্রান্সফার করার পর...?'

'সাবধান!' চাখার সিং-এর চাপা গলায় প্রায় ধমকের সুর। 'হ্যাঁ, আমরা দু'দলে ভাগ হয়ে যাবার পরের ঘটনা, নেভার মাইণ্ড। আমার লোকজনদের নিয়ে তারপুলিনটা ভাল করে বাঁধছিলাম, এই সময় ট্রাক নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখি এই ভদ্রলোককে...।'

বাধা দিয়ে চণ্ডমণ্ড গণ্ড জানতে চাইলেন, 'কতক্ষণ কথা বলেন আপনারা?'

'এক কি দু'মিনিট। তারপর তিনি দক্ষিণে, হারারের দিকে চলে গেলেন। আমার ধারণা, আপনাকে অনুসরণ করছিলেন ভদ্রলোক-প্রায় নিশ্চিত আমি।'

'জামবুকে ধরে ফেলেন উনি, রাস্তা থেকে সরে যেতে বাধ্য করেন,' গলা খাদে নামিয়ে যেন বিড়বিড় করছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, উদ্বেগে বেসুরো লাগল চাখার সিং-এর কানে। 'পার্ক ডিপার্টমেন্টের ট্রাক সার্চ করেন। না, কিছুই তিনি পাননি।'

'বোঝাই যাচ্ছে, তিনি সন্দেহ করেছেন।'

'যাচ্ছে,' ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে মেনে নিলেন অ্যামব্যাসাডর। 'কিন্তু যদি মাত্র দু'এক মিনিট আপনার সঙ্গে কথা বলে থাকেন, আপনাকে জড়াতে পারবেন না। এমন কি আপনি কে তা-ও তাঁর জানা নেই।'

'আমার ট্রাকে নাম ও ঠিকানা বড়বড় হরফে লেখা ছিল,' বলল চাখার সিং।

আবার কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আমি খেয়াল করিনি,' তারপর বললেন তিনি। 'মস্ত বোকামি করেছেন, মাই ফ্রেন্ড। উচিত ছিল লেখাগুলো মুছে ফেলা।'

'পাখি উড়াল দেয়ার পর খাঁচার দরজা বন্ধ করে লাভ কি,' যুক্তি দেখাল চাখার সিং।

'কোথায় রেখেছেন...?' থেমে গেলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, তারপর আবার জানতে চাইলেন, 'কোথায় রেখেছেন ওগুলো? জাহাজে তুলতে পেরেছেন?'

'এখনও পারিনি। কাল পাঠানো হবে।'

'আরও আগে পাঠানো যায় না?'

'সম্ভব নয়।'

'সেক্ষেত্রে মি. মাসুদ রানাকে আপনার সামলাতে হবে, তিনি যদি মাত্রা ছাড়িয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন।'

'হ্যাঁ,' চাখার সিং বলল। 'শুধু সামলাব না, তার একটা ভাল ব্যবস্থা করতে

হবে আমাকে। আপনার ওদিকটা? সব কিছু কাভার করেছেন? মার্সিডিজ?'

'করেছি।'

'ড্রাইভার দু'জন?'

'কোন চিন্তা নেই।'

'কর্তৃপক্ষ আপনার সঙ্গে দেখা করেছেন?'

'করেছেন, তবে স্রেফ রুটিন,' চাখার সিংকে আশ্বস্ত করলেন অ্যামবাসাডর। চমকে ওঠার মত কিছু ঘটেনি। আমাকে তারা আপনার নাম বলেনি। তবে দূতাবাসে আপনি আর কখনও আমাকে ফোন করবেন না। শুধু এই নম্বরটা নিরাপদ, আমার সিকিউরিটি অফিসাররা এটাকে ক্লিয়ার রেখেছে।' নম্বরটা উচ্চারণ করলেন তিনি, চাখার সিং লিখে নিল।

'এই ভদ্রলোক সম্পর্কে পরে আপনাকে জানাব,' বলল চাখার সিং। 'একটা বিদঘুটে উপদ্রব হয়ে দেখা দিয়েছেন।'

'আশা করি খুব বেশিক্ষণ আপনাকে জ্বালাতন করতে পারবেন না,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, পরমুহূর্তে হাত বাড়িয়ে ডেস্ক-থেকে তুলে নিলেন একজোড়া মূর্তি।

হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি একটি বাচ্চা মেয়ে আর এক বৃদ্ধ। অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি বসে আছে বৃদ্ধের কোলে, আদর ও স্নেহ-ভালবাসার কন্যাসুলভ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাকিয়ে আছে বলিরেখায় জর্জরিত, দাড়িবিশিষ্ট, অভিজাত চেহারার বৃদ্ধের মুখের দিকে। এই অপূর্ব শিল্পকর্ম তিনশো বছর আগে তোকুগাওয়া (TOKUGAWA) সাম্রাজ্যের একজন মহান শিল্পীর সৃষ্টি। আইভরি এত চমৎকার পালিশ করা হয়েছে যে জ্বলন্ত কয়লার মত চকচক করছে। শুধু জোড়ামূর্তিটাকে উল্টো করলে জানা যাবে যে ওদের কোলে থাকা চাদরের নিচে দু'জনেই সম্পূর্ণ নগ্ন, এবং দৈহিক মিলনের সমস্ত প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শেষ করেছে বৃদ্ধ।

শিল্পীর রসবোধ বিরাট আবেদন ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের শরীর ও মনে। তাঁর বিশাল সংগ্রহের মধ্যে এই জোড়ামূর্তিটাই সবচেয়ে প্রিয়। এই মুহূর্তে মূর্তি দুটোর ওপর আলতোভাবে আঙুল বুলাচ্ছেন তিনি। আইভরির মসৃণ ও পিচ্ছিল স্পর্শ সব সময় তাঁকে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে।

মাসুদ রানার তৎপরতার খবর তাঁর কানে আসবে বলে আশঙ্কা করছিলেন তিনি, তবু চাখার সিং-এর মেসেজ কম ধাক্কা দেয়নি তাঁকে। শিখ বন্ধুর প্রশ্নগুলো তাঁর মনে পুরানো সন্দেহগুলোকে জাগিয়ে তুলেছে। যে-সব সাবধানতা তিনি অবলম্বন করেছেন সেগুলোর কথা আরেকবার স্মরণ করলেন মনে মনে, এবার নিয়ে সম্ভবত একশো বার।

টিউইউই হেডকোয়ার্টার ক্যাম্প ত্যাগ করার পর তিনি লক্ষ করেননি যে তাঁর জুতো আর স্ল্যাকসের নিচে রক্ত লেগে আছে। মাসুদ রানা বলার পর লক্ষ করলেন। অপরাধের এই গুরুতর প্রমাণ, জাদেজি উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাবার বাকি কষ্টকর পথটুকু পেরোবার সময়, সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন ও অস্থির করে রাখে তাঁকে। অবশেষে মেইন হাইওয়েতে পৌঁছুলেন তাঁরা, দেখলেন তাঁদের জন্যে রঁদেভোয় অপেক্ষা করছে চাখার সিং। কাপড় ও জুতোয় রক্তের দাগ দেখিয়ে

তাকে তিনি তাঁর উদ্বেগের কথাও জানালেন।

'খুনের জায়গায় আপনি যাবেন কেন!' রীতিমত বকা দিল তাঁকে চাখার সিং। 'সাংঘাতিক বোকামি করে ফেলেছেন, নেতার মাইণ্ড।'

'দেখার দরকার ছিল কাজটা ঠিকমত হচ্ছে কিনা। দরকার যে ছিল, তার প্রমাণও আছে–তখনও বেঁচে ছিল ওয়ার্ডেন।'

'কাপড় আর জুতো আপনাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।'

অত রাতে রাস্তায় আর কোন যানবাহনের দেখা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না, তবু কোন ঝুঁকি নেয়নি তারা। হাইওয়ে থেকে অনেকটা দূরে সরে আসার পর পার্কের ট্রাক থেকে চাখার সিং-এর আসবাব-পত্র পরিবহনের গাড়িতে তোলা হয় আইভরি। সারি সারি গাছের আড়াল ছিল, কাজেই কেউ দেখতে পায়নি। ড্রাইভার দু'জনকে চাখার সিং-এর লোকজন সাহায্য করলেও আইভরিগুলো তুলতে প্রায় দু'ঘন্টার মত লেগে যায়।

ইতিমধ্যে চাখার সিং-এর উপস্থিতিতে ছোট একটা আগুন জ্বেলেছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। আগুনটা ভাল করে ধরার পর শুধু আণ্ডারওয়্যার ছাড়া বাকি সব কাপড় খুলে ফেললেন তিনি। লাগেজ থেকে বের করে নতুন কাপড় পরছেন, আগুনের ধারে উবু হয়ে বসে তাঁর পরিত্যক্ত কাপড় ও জুতো পুড়িয়ে ফেলল চাখার সিং। জুতোর রাবার সোল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। একটা লম্বা লাঠি দিয়ে আগুনটা উসকে দিল সে, লক্ষ রাখল সব যেন মিহি ছাই হয়ে যায়।

'মার্সিডিজেও অনেক জায়গায় রক্ত পাওয়া যাবে,' সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বলল চাখার সিং। 'মেঝেতে, অ্যাকসিলারেটরে, ব্রেক প্যাডেলে।' গাড়ির ফ্লোর ম্যাট আর কন্ট্রোলের নিচ থেকে রাবার কাভার বের করল সে, ওগুলোও পুড়িয়ে ফেলল। কালো ধোঁয়ায় চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে, তারপরও সন্তুষ্ট হলো না।

'গাড়িটা আপনার ত্যাগ করতে হবে।' কি করতে হবে চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে বলে দিল সে। 'বাকি সব আমি করব।'

রনেডো থেকে প্রথমে বিদায় নিলেন অ্যামব্যাসাডর। চাখার সিং-এর ট্রাকে সমস্ত আইভরি তখনও তোলা হয়নি, তার আগেই হারারের পথে রওনা হয়ে গেলেন তিনি।

দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, যেন প্রমাণ করতে চাইছেন হামলার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। রানা তাঁর কাপড়ে রক্ত দেখেছে অনেকক্ষণ আগে, এতক্ষণে গুরুতর শারীরিক প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। এ ঠিক যেন মাদাম সুসেমি ওয়াং-এর বাড়িতে যৌন-ক্রীড়া শেষ করার পরের অবস্থা। তাইপের ওই বাড়িটা প্রচণ্ড আকর্ষণ করে তাকে। সে-সব ভয়ঙ্কর নেশা তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে কাজ দেয়, তার একটা মেটে ওই বাড়িটায় গেলে। কিন্তু নেশা মেটার পর প্রতিক্রিয়া হয়। ঘাম পায় তাঁর, সমগ্র অস্তিত্বে একটা কাঁপুনি শুরু হয়। প্রতিবার নিজেকে আশ্বাস দেন তিনি, পরের বার এরকম ঘটবে না।

গলফ ক্লাবের কাছাকাছি একটা এভিনিউয়ে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের তৈরি প্রাসাদতুল্য অনেক বাড়ি আছে, তারই একটায় থাকেন অ্যামব্যাসাডর। মাঝরাতের অনেক পর পৌঁছুলেন তিনি ওখানে। পৌঁছেই চলে গেলেন নিজের

বেডরুম স্যুইটে। এক হপ্তা আগেই স্ত্রী ও সন্তানদের তাইওয়ানে পাঠিয়ে দিয়েছেন, শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে। এখানে তিনি একা।

আবার একবার কাপড় ছাড়লেন অ্যামব্যাসাডর। অকুস্থলে এই কাপড় পরে যাননি, তবু একটা প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে ফেললেন সব। শরীরে সামান্য একটু রক্ত থাকলে তা কাপড়েও লাগবে, এ-কথা ভেবে উদ্বিগ্ন বোধ করছেন। এরপর তিনি শাওয়ার সারলেন। পানির নিচে প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে ভিজলেন, চুলে শ্যাম্পু দিলেন দু'বার, শক্ত ব্রাশ দিয়ে হাত আর পায়ের নখ ঘষলেন বারবার।

এক সময় আশ্বস্ত হলেন, তাঁর শরীরে এক বিন্দু রক্ত বা গান পাউডার নেই। ড্রেসিং রুমে ঢুকে নতুন এক সেট কাপড় পরলেন আবার। প্লাস্টিক ব্যাগটা নিয়ে চলে এলেন বাড়ির গ্যারেজে, মার্সিডিজটা এখানেই রেখেছেন। বুটের ভেতর ক্যানভাস গ্রিপ-এর পাশে ব্যাগটা রেখে উঠে বসলেন ড্রাইভিং সীটে। চিউইউইয়ে নিয়ে গেছেন এমন প্রতিটি জিনিস ত্যাগ করার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন, এমনকি বিনকিউলার ও বার্ড-বুকটাও।

গ্যারেজ থেকে বের করে বাড়ির সামনের ড্রাইভওয়েতে মার্সিডিজ দাঁড় করালেন অ্যামব্যাসাডর। গেটটা খোলা রয়েছে, গাড়ির চাবি ইগনিশনে থাকল।

ইতিমধ্যে রাত দুটো বেজে গেছে। চব্বিশ ঘণ্টার বেশি হলো শরীরের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ধকল গেছে, তারপরও তাঁর ঘুম এল না। অসম্ভব নার্ভাস বোধ করছেন, পরনের সিল্ক রোব-এ খসখস আওয়াজ তুলে বেডরুমের মেঝেতে পায়চারি শুরু করলেন। তারপর শুনতে পেলেন স্টার্ট নিল মার্সিডিজ। বেডসাইড ল্যাম্পের সুইচ অফ করে ছুটে গেলেন জানালার দিকে, পর্দা সামান্য সরিয়ে উঁকি দিলেন বাইরে। হেডলাইট জ্বালা হয়নি, ড্রাইভওয়ে থেকে বেরিয়ে নির্জন রাস্তায় পড়ল মার্সিডিজ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বিছানায় এসে বসলেন তিনি।

ঘুমের জন্যে সাধ্য-সাধনা করছেন, তারই ফাঁকে ভাবছেন এত তাড়াতাড়ি কিভাবে আয়োজনটা করতে পারল চাখার সিং। তারপর তাঁর মনে পড়ল, হারারে শাখার পারিবারিক স্বার্থ দেখাশোনা করে চাখার সিং-এর ছেলে। ছেলেটা বাপের মতই বুদ্ধিমান আর বিশ্বস্ত।

সকালে, ব্রেকফাস্ট সারার পর, পুলিসকে ফোন করে চণ্ডমণ্ড গঙ্গ মার্সিডিজ চুরির ঘটনাটা রিপোর্ট করলেন। চব্বিশ ঘণ্টা পর পুলিস ওটাকে খুঁজে পেল, এয়ারপোর্টে যাবার পথে হার্টফিল্ড-এ। চাকা ও এঞ্জিন খুলে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে গাড়িটায়। ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়েছে, উদ্ধার করার মত কিছুই নেই। অ্যামব্যাসাডর জানেন, বীমা কোম্পানী ক্ষতিটা পূরণ করে [illegible], প্রায় কোন আপত্তি বা দেরি না করেই।

পরদিন সকালে অজ্ঞাতপরিচয় এক লোক ফোন করল তাঁকে, [illegible] নম্বর কোন তালিকায় নেই। নিজের পরিচয় বা কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে [illegible] তাকে বলল, 'আজকের হেরাল্ড দেখুন, পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠায়,' বলেই যোগাযোগ [illegible] কেটে দিল সে। গলার আওয়াজটা চেনা চেনা লাগল চণ্ডমণ্ড গঙ্গের। লোকটা [illegible] এশিয়ান, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কথা বলার ঢঙটাও চাখার সিং-এর সঙ্গে [illegible]।

পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠার নিচের দিকে খবরটা দেখতে পেলেন অ্যামব্যাসাডর।

হেডিংটা তাৎপর্যহীন, নিচে মাত্র ছ'লাইনের একটা রিপোর্ট। 'মাতালদের মারামারি, ছুরিকাঘাতে একজনের মৃত্যু।' হেডিঙের নিচে খবরটা এরকম—'জামবু চারকা, ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিসের একজন রেঞ্জার, একটা শুঁড়িখানায় বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া ও তর্ক করার সময় ছুরি খেয়ে মারা গেছে। অকুস্থলে পুলিস পৌঁছুনোর আগেই মাতালরা পালিয়ে যায়।'

[illegible] সেই অজ্ঞাতপরিচিত ব্যক্তি [illegible] করে [illegible] বলল, 'সাত নম্বর পৃষ্ঠায়।' এবার নিশ্চিত হলেন তিনি, গলাটা চাখার সিং-এর ছেলের।

এবারের হেডিং—'রেল দুর্ঘটনা'। নিচের খবরটা এরকম—'হার্টলে-র কাছাকাছি একটা রেলক্রসিং-এ ট্রেনে কাটা পড়েছে এক লোক। লাশটা পরে জানু দোরাদের বলে সনাক্ত করা হয়। ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিসের একজন রেঞ্জার সে, তবে ডিউটিতে ছিল না। পুলিস জানিয়েছে, মাতাল অবস্থায় ট্রেনে কাটা পড়ে সে। জিম্বাবুই রেলওয়ের একজন মুখপাত্র জনসাধারণকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, গার্ডবিহীন ক্রসিং পেরোবার সময় সতর্ক থাকতে হবে। বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত হার্টলে লাইনে এ-ধরনের দুর্ঘটনা চারটে ঘটল।'

চাখার সিং যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ঘটনার কোন সাক্ষি বা প্রমাণ নেই।

তিন দিন পর পুলিস কমিশনার স্বয়ং টেলিফোন করলেন অ্যামব্যাসাডরকে। 'আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে সত্যি আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ইওর এক্সেলেন্সী। ধরে নিচ্ছি চিউইউই ক্যাম্পে হামলা সম্পর্কে আপনি পড়েছেন। এই দুঃখজনক ঘটনা তদন্তে আশা করি আপনি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন।'

'সাধ্যমত চেষ্টা করব, অফকোর্স।'

'আমাকে জানানো হয়েছে, সেদিন আপনি একজন ভিজিটর হিসেবে ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন। হামলা শুরু হবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে চলে আসেন।'

'ঠিক তাই, কমিশনার।'

'আমাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটা বিবৃতি দিতে আপনার কোন আপত্তি আছে? আসলে এ-ধরনের কিছু করতে আপনি বাধ্য নন। ডিপ্লোম্যাটিক সুবিধেপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে আপনার নিরাপত্তা সব দিক থেকে সুরক্ষিত থাকবে।'

'সম্ভাব্য যে-কোন সাহায্য করতে চাই আমি। নিহত ওয়ার্ডেনকে আমি চিনতাম, [illegible] আমার অত্যন্ত ভাল লাগত। এটা একটা নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ, আমি চাই অপরাধীরা ধরা পড়ুক।'

'[illegible] আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, ইওর এক্সেলেন্সী। আমি তাহলে আমার একজন [illegible] ইন্সপেক্টরকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিই?'

[illegible] কাপড়ে মোটাসোটা এক শোনা, জিম্বাবুইয়ান পুলিসের ইউনিফর্ম [illegible] স্মার্ট সার্জেন্টকে সাথে করে নিয়ে এসেছে। ক্ষমা চেয়ে নেয়ার পর [illegible] কাছ থেকে চিউইউই ভ্রমণের বর্ণনা আদায় করল সে। রিফ্রিজারেটর [illegible] কনভয়ের সঙ্গে চিউইউই ত্যাগ করেন তিনি, লিখিত রিপোর্টের এই [illegible] নিচে রেখা টানল। কি বলবেন তা আগেই মুখস্থ করে রেখেছিলেন [illegible] কাজেই কোথাও আটকালেন না। রানার সঙ্গে তাঁর দেখা

হওয়ার ঘটনাটা বলার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকলেন।

তাঁর কথা শেষ হতে ইতস্তত করল ইন্সপেক্টর, তারপর জানতে চাইল, 'মি. মাসুদ রানাও একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, ইওর এক্সেলেন্সী। আপনি যা কিছু আমাকে বললেন, তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। তবে এক জায়গায় ভিন্ন বর্ণনা করেছেন উনি। আপনার কাপড়ে আর জুতোয় রক্ত লেগে থাকতে দেখেছেন তিনি।'

'কখনকার ঘটনা সেটা?' চেহারা বিমূঢ় করে তুললেন অ্যামব্যাসাডর।

'যখন তিনি আপনাকে এবং পার্কের ট্রাকগুলোকে থামালেন, চিউইউইয়ে তাঁর ফিরে আসার পথে—পথের ওপর হানাদারদের পায়ের ছাপ দেখার পর।'

চণ্ডমুণ্ড গজের চেহারা থেকে বিমূঢ় ভাব দূর হয়ে গেল। 'ও, হ্যাঁ। পার্কের এলিফ্যান্ট কালিং অপারেশনের একজন উৎসাহী দর্শক ছিলাম আমি। বুঝতেই পারছেন, অপারেশনের সময় চারদিকে প্রচুর রক্ত ছিল...নিশ্চয়ই সেই রক্তের ওপর পা ফেলেছিলাম।'

এই পর্যায়ে বিব্রত ইন্সপেক্টর ঘামতে শুরু করেছে। 'আপনার কি মনে আছে, ইওর এক্সেলেন্সী, সেদিন সন্ধ্যায় কি পরেছিলেন আপনি?'

ভুরু কুঁচকে স্মরণ করার ভান করলেন চণ্ডমুণ্ড গজ। 'ওপেন-নেক শার্ট, ব্লু কটন স্ল্যাকস, আর সম্ভবত একজোড়া কমফোর্টেবল রানিং শু। সাধারণত এই সবই পরি আর কি।'

'ওগুলো আপনার কাছে এখনও আছে তো?'

'হ্যাঁ, কি বলেন, কেন থাকবে না। শার্ট আর স্ল্যাকস নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে ধুয়ে ইস্ত্রি করা হয়ে গেছে। জুতো জোড়াও পরিষ্কার করা হয়েছে। আমার স্টাফ কোন কাজ ফেলে রাখে না...,' হঠাৎ থেমে হাসলেন অ্যামব্যাসাডর, যেন এইমাত্র একটা কথা মনে পড়ে গেছে। 'ইন্সপেক্টর, আপনি কি ওগুলো দেখতে চান? ইচ্ছে করলে পরীক্ষা করার জন্যে ওগুলো আপনি সঙ্গে করে নিয়েও যেতে পারেন।'

এবার ইন্সপেক্টরের বিব্রতবোধ বেদনাদায়ক হয়ে উঠল। চেয়ারে নড়েচড়ে আরও ছোট করে ফেলল সে নিজেকে। 'এ-ধরনের সহযোগিতার জন্যে আপনাকে আমরা অনুরোধ করতে পারি না, ইওর এক্সেলেন্সী। তবে, মি. রানার দেয়া স্টেটমেন্টের কথা মনে রেখে আর আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে...'

'অবশ্যই কোন আপত্তি নেই,' তাকে আশ্বস্ত করলেন চণ্ডমুণ্ড গজ। 'আমি তো পুলিস কমিশনারকে আগেই বলেছি, সম্ভাব্য যে-কোন সাহায্য করতে চাই।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন। 'তবে, এক ঘণ্টার মধ্যে স্টেট হাউজ-এ পৌঁছুতে হবে আমাকে, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে লাঞ্চ খাব। ওগুলো যদি আমি আমার একজন স্টাফকে দিয়ে আপনাদের হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিই, আপনি কিছু মনে করবেন?'

পুলিস অফিসাররা লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল। 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে অত্যন্ত দুঃখিত, ইওর এক্সেলেন্সী। আপনি যে সাহায্য করেছেন তার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। আমার ধারণা, পুলিস কমিশনার স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে জানাবেন আপনাকে।'

ডেস্কের পিছন থেকে না উঠেই দরজার কাছে ইন্সপেক্টরকে দাঁড় করালেন চণ্ডমণ্ড গঙ। 'রেকর্ডে দেখলাম, হামলাকারীদের সন্ধান পাওয়া গেছে, সত্যি নাকি? আপনারা তাহলে চুরি যাওয়া আইভরি উদ্ধার করতে পেরেছেন?'

'জাদেজি নদী পেরিয়ে জঙ্গিরাও পালাচ্ছিল দুষ্কৃতকারীরা, তাদেরকে বাধা দেয়া হয়। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, সবাই তারা হয় মারা গেছে নয়তো পালিয়েছে। আইভরিগুলো হয় আগুনে পুড়েছে নয়ত নদীতে ডুবে গেছে।'

'স্যাড, ভেরি স্যাড...' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চণ্ডমণ্ড গঙ। 'এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জন্যে ওদের কঠিন সাজা হওয়া উচিত ছিল।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'তবে, এতে করে আপনাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল, তাই না?'

'ফাইল বন্ধ করে দিচ্ছি আমরা,' উত্তরে বলল ইন্সপেক্টর। 'আলগা সুতোগুলো জোড়া লাগাতে আপনি সাহায্য করার পর একটা কাজই বাকি থাকল এখন—আপনাকে লেখা কমিশনারের চিঠি। তারপরই গোটা ব্যাপারটার ইতি ঘটবে।'

নিজের ওয়ার্ডোব থেকে যে কাপড়গুলো পুলিস হেডকোয়ার্টারে পাঠালেন চণ্ডমণ্ড গঙ সেগুলো চিউইডউই বা জাদেজি উপত্যকার কোথাও পরাই হয়নি। এই মুহূর্তে সে-কথা ভেবে আপন মনে ক্ষীণ একটু হাসলেন তিনি। জোড়া আইভরি মূর্তি রেখে দিলেন ডেস্কের ওপর, এখনও সেটার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভাবছেন, ইন্সপেক্টরের কথা ঠিক নয়, ব্যাপারটার এখনও ইতি ঘটেনি। মাসুদ রানা যতক্ষণ আশপাশে ঘুর ঘুর করবেন ততক্ষণ সমস্যাটা থেকেই যাবে।

ভাবছেন, এবারও কি চাখার সিং-এর ওপর ভরসা রাখা ঠিক হবে? দু'জন সাধারণ পার্ক রেঞ্জারকে সরানো আর মাসুদ রানার মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বকে সরানো এক কথা নয়। তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলে প্রশ্ন উঠবে, তোলপাড় শুরু হবে চারদিকে।

ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিলেন তিনি, ডেস্কে রাখা মাইক্রোফোনে কথা বললেন ক্যান্টনিজ ভাষায়। 'সুজি, আমার কাছে চলে এসো, প্লীজ।'

সেক্রেটারিকে আসতে না বলেও প্রশ্ন করতে পারতেন তিনি। আসতে বললেন তাকে দেখতে তাঁর ভাল লাগে বলে। পাহাড়ী এলাকার মিষ্টি মেয়ে সুজি ফেং, ভারি বুদ্ধিমতী আর অনুগত। তাইওয়ান ইউনিভার্সিটিতে খুব ভাল রেজাল্ট করেছে ও, যদিও শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্যে তাকে চাকরি দেননি তিনি।

ডেস্কের পাশে দাঁড়াল সুজি ফেং, এতটা কাছে যে যদি ইচ্ছে করেন চণ্ডমণ্ড গঙ যাতে ছুঁতে পারেন তাকে। সে জানে, আত্মসমর্পণের এই ভঙ্গিটা বিশেষভাবে পছন্দ করেন তার বস্। আধুনিক শিক্ষা পেলেও, শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য তাকে পুরুষদের প্রতি অনুকূল মনোভাব দেখাতে শিখিয়েছে। শিখিয়েছে বিশেষ করে প্রভুর সমস্ত দাবি তাকে মেটাতে হবে।

'কান্টাস এয়ারলাইনে আমার রিজার্ভেশন কনফার্ম করেছ?' জানতে চাইলেন অ্যামব্যাসাডর।

রানা লিলঙুয়েতে গরু খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কাজেই এই ফাঁকে তাইপেতে ফিরে যাওয়া উচিত তাঁর। চিউইডউই অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়ার কোন ইচ্ছে তাঁর হঠাই

না, যদি আরও কিছুদিন দূতাবাসে থাকতে চাইতেন তিনি। তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা এরই মধ্যে চলে গেছে, মাসের শেষ দিকে তিনিও কেটে পড়বেন। আর মাত্র আট দিন পর।

'জ্বী, রিজার্ভেশন কনফার্ম করা হয়েছে, ইওর এক্সেলেন্সী,' গলার সুরে শ্রদ্ধা, ফিসফিস করে বলল সুজি ফেং। পাহাড়ের ওপর চক্রমণ্ড গণ্ডের বাবার লেডিস গার্ডেন আছে, সেখানে নাইটিঙ্গেলের মিষ্টি গান শোনা যায়, সুজি ফেঙের গলা তাঁর কাছে ঠিক সেরকম মিষ্টি লাগে। রীতিমত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তিনি।

'জিনিস-পত্র গোছানোর জন্যে লোকগুলো কখন আসবে?' জানতে চাইলেন তিনি, হাত দিলেন সুজি ফেঙের গায়ে। তাঁর ছোঁয়া পেয়ে সামান্য কেঁপে উঠল মেয়েটা, তাতে করে আরও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন চক্রমণ্ড গণ্ড।

'সোমবার সকালে, মি. লর্ড।' সুজির কালো চুল আলো লেগে চকচক করছে কাঁধের ওপর।

সুজির চিওং-সাম ড্রেসের ফাঁকে হাত গলিয়ে ত্বকের স্পর্শ নিলেন অ্যাম্বাসাডর, আইভরির মূর্তির মত মসৃণ। 'তুমি ওদেরকে সাবধান করে দিয়েছ তো, বলেছ আমার আর্ট কালেকশন অত্যন্ত ভঙ্গুর আর মূল্যবান?' প্রশ্নটা শেষ করেই সুজির উরুতে প্রচণ্ড জোরে চিমটি দিলেন তিনি।

ব্যথায় কেঁপে উঠল সুজি, নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। 'ইয়েস, মি. লর্ড,' ফিসফিস করল সে, এটা তার বসের শিখিয়ে দেয়া সম্বোধন।

সুজির উরুতে নক্ষত্র আকৃতির একটা দাগ তৈরি হয়েছে, আজ রাতে যখন সে তার প্রভুর কাছে আসবে তখনও ওখানে থাকবে ওটা।

ব্যথা দেয়ার ক্ষমতা অনুপ্রাণিত করে তুলল চক্রমণ্ড গণ্ডকে। রানার কথা ভুলে গেলেন তিনি, ভুলে গেলেন ওর দিক থেকে সম্ভাব্য কি বিপদ আসতে পারে। পুলিস তাঁর পিঠ থেকে নেমে গেছে, আর সুজি ফেঙকে মনে হচ্ছে লোভনীয়। আট দিন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা হচ্ছে না, কাজেই এই ক'টা দিন সুজিকে নিয়ে ফুর্তি করা যেতে পারে। তারপর তিনি বাড়ি ফিরবেন, আশ্রয় নেবেন বাবার ছত্রছায়ায়।

আট

ল্যাণ্ডক্রুজারের পিছনের দরজা খুলে সুপারমার্কেট থেকে কেনা জিনিসগুলো রাখল রানা, তারপর ড্রাইভিং সীটে বসে পকেট থেকে নোটবুকটা বের করল, চোখ বুলাল চাম্বার সিং-এর অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তালিকার ওপর।

লোকজনকে জিজ্ঞেস করে শহরের হালকা শিল্পাঞ্চলে চলে এল ও, রেলওয়ে লাইন আর স্টেশনের কাছাকাছি। এখানে মনে হলো চার কি পাঁচ একর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্লট রয়েছে চাম্বার সিং-এর, তার মধ্যে কোন কোনটায় ঝোপ-ঝাড় জন্মেছে। এরকম একটা খালি প্লটে একটা সাইনবোর্ড দেখল রানা, লেখা রয়েছে–

আরেকটা চাখার সিং প্রজেক্ট
প্রস্তাবিত কটন কার্ডিং ফ্যাক্টরির জন্যে নির্বাচিত স্থান
উন্নতি! কর্মসংস্থান! প্রগতি!
সবই মানবিক জন্যে!

বাকি প্রতিটির পাশেই, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, চাখার সিং-এর ভিহাকিল ওঅর্কশপ এরিয়া। সামনের দিকে অন্তত একশো নতুন ট্রাক্টর ডোজার দাঁড়িয়ে রয়েছে; বন্দর থেকে রেলে তুলে আনা হয়েছে ওগুলো, এখনও ধুলো ঝাড়া হয়নি। বোঝাই যায়, ডেলিভারি দেয়ার আগে মেইন ওঅর্কশপ বিল্ডিঙে পাঠানো হবে। খোলা সামনের দরজা দিয়ে মেকানিকদের একটা টিমকে কাজ করতে দেখল রানা। ফোরম্যানরা বেশিরভাগ এশিয়ান বা ভারতীয়, কয়েকজন পাগড়ি পরা শিখও আছে, তবে ওভারঅল পরা মেকানিকরা সবাই স্থানীয় ও কালো। দেখে মনে হলো ব্যবসাটা ভালই চলছে।

সামনের উঠনে ঢুকে ল্যাণ্ডক্রুজার থেকে নামল রানা। নীল ডাস্ট-কোট পরা একজন ফোরম্যানের সঙ্গে কথা বলল। ল্যাণ্ডক্রুজার সার্ভিসিং করাবার ছুতোয় ওঅর্কশপ আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল ও। কিন্তু না, এখানে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে চুরি করা আইভরি লুকিয়ে রাখা সম্ভব।

ফোরম্যানকে বলল রানা, কাল সকাল আটটার দিকে ল্যাণ্ডক্রুজার পাঠিয়ে দেবে ও। গল্প করার ছলে জেনে নিল স মিল আর চাখার সিং ট্রেডিং কোম্পানীর ওয়্যারহাউসটা পরের রাস্তায়, ভেহিকেল ওঅর্কশপের ঠিক পিছনে।

ল্যাণ্ডক্রুজার নিয়ে চলে এল রানা, আরেক দিক থেকে ঢুকল পাশের রোডে। রোডের মাথা থেকেই দেখা গেল স মিলটাকে। এক ডজন রেলওয়ে ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাইভেট রেলওয়ে সাইডিং-এ, প্রতিটিতে পাহাড়ের মত উঁচু করে তোলা হয়েছে ভারি লগ। স মেশিন দিয়ে কাঠ কাটার শব্দ দূর থেকেও পরিষ্কার শোনা গেল।

গেটের পাশ দিয়ে এগোবার সময় খোলা শেডগুলোর ভেতর তাকাল রানা। স মেশিনগুলোর ঘুরন্ত তিক্ষ্ন পারদের মত চকচক করছে, কর্কশ লগে ব্লেডগুলো কামড় দেয়ায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে হলুদ কাঠের গুঁড়ো।

ধীরগতিতে গাড়ি চালিয়ে সরে এল রানা। স মিলের কোনাকুনি উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়্যারহাউস কমপ্লেক্স। গোটা কমপ্লেক্স উঁচু ডায়মণ্ড-মেশ ফেন্স দিয়ে ঘেরা–কংক্রিটের শক্ত ও মোটা পোল-এর সঙ্গে প্লাস্টিক-কোটেড সবুজ তার, মাথাগুলো কাত হয়ে আছে রাস্তার দিকে, কাঁটাতার দিয়ে ছাওয়া।

পাঁচটা আধা-বিচ্ছিন্ন ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে ওয়্যারহাউসটাকে। ছাদের ঢাল আর চূড়াগুলো আকৃতি পেয়েছে ঠিক যেন করাতের দাঁত, রঙবিহীন করোগেটেড অ্যাসবেস্টস দিয়ে মোড়া। দেয়ালগুলোও করোগেটেড অ্যাসবেস্টস। পাঁচটা ইউনিটেরই আলাদা দরজা, দরজাগুলো রোলার টাইপের, সাধারণত এয়ারক্রাফট হ্যাঙ্গারে যেমন দেখা যায়।

গেটে একটা সাইনবোর্ড রয়েছে, তাতে লেখা–

চাখার সিং ট্রেডিং কোম্পানী
সেন্ট্রাল ডিপো অ্যাণ্ড ওয়্যারহাউস

নিজের নাম ফাটাতে লজ্জা পায় না লোকটা, ভাবল রানা। প্রবেশপথের পাশে একটা ইটের তৈরি ছোট অফিস রয়েছে। গেটে সশস্ত্র একজন সেন্টিনেলও পাহারায় আছে বলে মনে হলো রানার। শেষ বিল্ডিংটার কাছে এসে দেখল লম্বা অ্যাসবেসটস দরজা গুটিয়ে খোলা হয়েছে। বিশাল গুহা আকৃতির ওয়্যারহাউসের ভেতরটা দেখার সুযোগ হলো ওর।

হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, ওয়্যারহাউসের মাঝখানে প্রকাণ্ড প্যানটেকনিকনটাকে দেখতে পেয়ে পালস রেট বেড়ে গেছে। চার রাত আগে আসবাব-পত্র পরিবহনের এই ভ্যানটাকে চিকণ্ড রোডে শেষবার দেখেছিল ও। ওটার পিছনে এখনও জোড়া লাগানো রয়েছে ডারপুলিন মোড়া দশ চাকার ট্রেইলরটা–লাল ধুলোয় ঢাকা, ঠিক ওর ল্যাণ্ডক্রুজারের মত।

ট্রেইলরের পিছনের দরজা খোলা, দশ-বারোজন কালো শ্রমিক একটা ফর্কলিফট ট্রাকের সাহায্য নিয়ে কার্গো লোড করছে–খয়েরি রঙের বস্তায় ভরা, ভুট্টা হতে পারে, হতে পারে চিনি বা চাল।

জাম্বেজি উপত্যকায় কার্গো বলতে শুকনো মাছের ব্যাগ দেখেছিল রানা, সেগুলোর একটাও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পাশের জানালার কাচ নামাল, ভাবল গন্ধ পাবে, কিন্তু নাকে শুধু ধুলো আর ডিজেলের ঝাঁঝ ঢুকল।

তারপর ওয়্যারহাউসটাকে পাশ কাটিয়ে সামনে বাড়ল ল্যাণ্ডক্রুজার। একটা 'ইউ' টার্ন নিয়ে আরেকবার দেখবে নাকি? উঁহু, উচিত হবে না, সিদ্ধান্ত নিল রানা। এরই মধ্যে যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

ক্যাপিটাল হোটেলে ফিরে এল রানা, গেস্ট'স কার পার্কে ল্যাণ্ডক্রুজার রেখে উঠে এল নিজের কামরায়। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে শরীর থেকে ধুয়ে ফেলল ঘাম আর আফ্রিকার ধুলো। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়াল। প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'শোনো, রানা। উচিত কাজ হবে তোমার সন্দেহ পুলিসকে জানানো। কাজটা তাদের, তাদেরকেই দাও।'

'কবে থেকে আমরা,' জবাব দিল প্রতিচ্ছবি, 'উচিত কাজ করছি, রানা? তাছাড়া, এটা আফ্রিকা। নড়তেই তিন-চারদিন সময় নেবে পুলিস। এমনিতেই যে-সময় পেয়েছে চাখার সিং, সমস্ত আইভরি নিরাপদ কোথাও লুকিয়ে রেখেছে সে। কালকের মধ্যে আইভরি সহ তাকে ধরা অসম্ভব হয়ে উঠবে।'

'তুমি আমাকে বলতে চাইছ, রানা, প্রশ্নটা সময়ের?'

'ঠিক তাই, বন্ধু।'

'ব্যাপারটা এমন নয় তো, বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার নেশাটা পেয়ে বসেছে তোমাকে?'

'নেশা একটা আছে, সেটা প্রতিশোধের, বন্ধু। তুমি কি আলি শাহ আর তার ছেলেমেয়েদের কথা ভুলে গেছ?'

'না, ভুলব কেন। সে কি ভোলবার।'

'তাহলে আর কথা নয়। প্রস্তুতি নাও।'

ডিনার খেয়ে এসে প্রস্তুতি নিতে শুরু করল রানা। কোন তাড়া নেই। মাঝরাতের আগে বেরুতে পারছে না ও। প্রস্তুতি শেষ করার পর বিছানায় শুয়ে থাকল, উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ অনুভব করছে। খানিক পরপর হাতঘড়ি দেখল ও। রাত বারোটা বাজতে আজ যেন বেশি সময় লাগছে। অপেক্ষার সময়টা সব সময় পীড়া দেয়।

শেষ কয়েকজন খদ্দেরকে সুপারমার্কেট থেকে বেরিয়ে যাবার অনুরোধ করল গার্ডরা, তারপর কাচ লাগানো জোড়া দরজা বন্ধ করে দিল। দেয়ালঘড়িতে দশটা বেজে পাঁচ। আয়না লাগানো জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে সব দেখছে চাখার সিং। সুইপাররা এরই মধ্যে তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে, দ্রুত হাতে ক্যাশ মেলাচ্ছে তার মেয়েরা।

খানিক পর ওরা ওদের মায়ের নেতৃত্বে একটা মিছিল করে অফিস রূমে ঢুকল। সারাদিন বেচা-বিক্রির সব টাকা রাখা হলো তার ডেস্কে—নোটগুলো সযত্নে বাণ্ডিল করা, খুচরো মুদ্রা ভরা হয়েছে ক্যানভাস ব্যাগে। স্ত্রীর হাত থেকে কমপিউটর প্রিন্টআউট নিয়ে চোখ বুলাল চাখার সিং, এতে সর্বমোট বিক্রির যোগফল দেয়া আছে।

'বহুত খুব, বহুত খুব!' হিন্দীতে বলল সে। 'এত ভাল বেচা-কেনা ক্রিস্টমাস ইভ-এর পরে আর হয়নি।' লেজার না দেখেও গত ছ'মাসে কবে কত বিক্রি হয়েছে, মুখস্থ বলতে পারবে সে।

টাকা-পয়সা সামলে রাখল চাখার সিং। তারপর স্ত্রীকে বলল, 'ডিনার খেতে আজ আমার দেরি হবে। জরুরী কাজ আছে, ওয়্যারহাউসে যেতে হবে।'

'একা বসলে আপনি তো আবার খেতে পারেন না,' প্রৌঢ়া স্ত্রী বলল। 'আমি তাহলে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।'

'না, তার কোন দরকার নেই—কখন ফিরি তার কি কোন ঠিক আছে। তোমরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো। মেয়েরা? আমার সোনামণিরা?' একে একে চার মেয়ের দিকে তাকাল চাখার সিং। 'বলো, তোমাদের জন্যে কি করতে পারি আমি? কারও কোন আবদার আছে?'

চার বোন ঘিরে ধরল বাবাকে। মিষ্টি গলায় হৈ-চৈ করে উঠল ওরা। সবারই এক আবদার! 'পিতাজি, বেশি রাত কোরো না, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

মেয়েদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল চাখার সিং, বলল, 'ঠিক আছে, বেশি রাত করব না।'

আবার মিছিল করে বেরিয়ে গেল সবাই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল চাখার সিং। সব ক'টা মেয়েই তার লক্ষ্মী। আহা, সবাই ওরা যদি ছেলে হত! এককেটা জামাই যোগাড় করতে না জানি কত টাকা বেরিয়ে যায়!

ক্যাডিলাকে চড়ে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায় চলে এল সে। গাড়িটা নতুন নয়। বৈদেশিক মুদ্রার খুব টানাটানি, সাধারণ একজন নাগরিককে বিলাসবহুল গাড়ি আমদানি করতে দেয়া হয় না। অবশ্য চাখার সিং নিজস্ব একটা সিস্টেম তৈরি

করে নিয়েছে। আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটিক স্টাফ হিসেবে নতুন চাকরি পায় যারা মালাবিতে, ওয়াশিংটন ত্যাগ করার আগেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে। মালাবি কাস্টমস রেগুলেশন তাদেরকে নতুন গাড়ি আমদানি করার অনুমতি দেয়, শর্ত থাকে চাকরির মেয়াদ শেষে স্থানীয় বাজারে সেটা বিক্রি করে যেতে হবে। গাড়িটা মালাবিতে পৌঁছুনো মাত্র যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাডিলাকের যা দাম তার দ্বিগুণ টাকা দেয় সে তাদেরকে, স্থানীয় মুদ্রায়। এই টাকায় পুরো তিন বছর মালাবিতে রাজকীয়ভাবে চলাফেরা করতে পারে তারা, বেতনের সমস্ত টাকা ব্যাংকে জমা হয়। তারা চলে গেলে গাড়ির মালিক হয় চাখার সিং। প্রতিটি গাড়ি একবছর চালায় সে, তারপর তার টয়োটা এজেন্সির শো-রুমে রাখে-গায়ে দাম লেখা থাকে, যুক্তরাষ্ট্রে যে-দামে কিনতে পাওয়া যায় তার তিন গুণ। সাধারণত এক হপ্তার ভেতর বিক্রি হয়ে যায় গাড়ি। চাখার সিং-এর কাছে কোন লাভই তুচ্ছ নয়, গ্রহণযোগ্য নয় কোন লোকসান। মালাবিতে ব্যবসা করতে এসে বিপুল ধন-সম্পদ অর্জন করেছে সে, এটা কোন দুর্ঘটনা বা ভোজবাজি নয়, এর পিছনে আছে কঠোর পরিশ্রম আর নিজের স্বার্থ বোঝার ধারালো বুদ্ধি। তার সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কে মেয়েদের তো নয়ই, এমনকি তার স্ত্রীরও পরিষ্কার কোন ধারণা নেই।

ঠেলে ওয়্যারহাউস গেটের বুম সরিয়ে দিল চেরিস, ক্যাডিলাক নিয়ে ভেতরে ঢুকল চাখার সিং। ভেতরে ঢুকেই গাড়ি থামাল সে, জানতে চাইল, 'ইয়েস?'

দেঁতো চেরিস জবাব দিল, 'সে এসেছিল, বস্। আপনি যেমন বলেছিলেন। চারটে দশ মিনিটে এই রাস্তা দিয়ে ট্রাক চালিয়ে গেছে। সে-ই একই ট্রাক। ধীরে ধীরে চালাচ্ছিল, সারাক্ষণ তাকিয়ে ছিল জাল আর বেড়ার দিকে।'

চেহারায় অস্বস্তি, ভুরু কুঁচকে আছে চাখার সিং। 'লোকটা অভদ্র হয়ে উঠছে। নেভার মাইণ্ড।' বসের দিকে তাকাচ্ছে না চেরিস, তবে হাসি পাচ্ছে তার। কারণ সে ইংরেজি প্রায় জানে না বললেই হয়, অথচ বস্ ইংরেজিতে কথা বলছেন।

'চলো আমার সঙ্গে,' নির্দেশ দিল চাখার সিং। ক্যাডিলাকের পিছনের সীটে উঠে বসল চেরিস, এতটা বোকা নয় আবার যে বসের পাশে বসার সাহস দেখাবে।

ওয়্যারহাউস কমপ্লেক্সের সামনে দিয়ে ধীরগতিতে গাড়ি চালাল চাখার সিং। লম্বা সবগুলো দরজা এরইমধ্যে রাতের জন্যে বন্ধ করে তালা দেয়া হয়েছে। গোটা কমপ্লেক্সে কোন অ্যালার্ম সিস্টেম নেই, এমনকি ফ্লাডলাইটের সাহায্যে পেরিমিটার ফেন্স-এ আলো ফেলারও কোন ব্যবস্থা নেই।

দুই কি তিন বছর আগে একটা সময় গেছে প্রায় প্রতিদিনই চুরি হত। অ্যালার্ম বা ফ্লাডলাইটের আলো দুঃসাহসী চোরদের বাধা দিতে পারত না। মরিয়া হয়ে এলাকার সবচেয়ে বিখ্যাত ওঝার পরামর্শ চাইল সে। এই বুড়ো ওঝা বা যাদুকর বাস করে কুয়াশা ঢাকা নির্জন মুলাঞ্জ মালভূমিতে, শুধু নিজের কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে।

খ্যাতি অনুসারে ফি দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হলো ওঝাকে। শিষ্যদের নিয়ে পাহাড় থেকে নিচে নেমে এল সে। বিরাট আয়োজন ও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের

মাধ্যমে সে তার অধীনস্থ ও সবচেয়ে শক্তিশালী আত্মা এবং শয়তান ও পিশাচদের নিয়োগ করল ওয়্যারহাউসের পাহারায়।

অনুষ্ঠানটা দেখার জন্যে শহরের সমস্ত লোফার, ভবঘুরে আর অলস বেকারদের আমন্ত্রণ জানাল চাখার সিং। কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে তারা দেখল, প্রথমে ওঝা ওয়্যারহাউসের পাঁচটা দরজায় একটা করে কালো মোরগ জবাই করল, আর সেটার রক্ত [illegible] একটা পাত্রে, তারপর সেই রক্ত ছিটিয়ে দেয়া হলো দরজার গায়ে। তারপর পেরিমিটার ফেন্স-এর প্রতিটি কর্নার পোস্ট-এ বেবুনের একটা করে খুলি রাখল ওঝা। দর্শকরা মুগ্ধ ও প্রভাবিত হলো। সেদিন থেকে গোটা শহরে জানাজানি হয়ে গেল যে চাখার সিং জাদুর সাহায্যে নিজেকে সুরক্ষিত করেছে।

এরপর ছ'মাস আর কোন চুরির ঘটনা ঘটেনি। তারপর শহরের একটা দুঃসাহসী গ্যাঙ সিদ্ধান্ত নিল, জাদুর ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখবে তারা। এক ডজন টেলিভিশন আর প্রায় চল্লিশটা ট্রানজিসটর রেডিও নিয়ে অনায়াসে পালিয়ে গেল দলটা।

ওঝাকে ডেকে চাখার সিং মনে করিয়ে দিল, সে তাকে গ্যারান্টি দিয়েছিল। প্রচুর কথা কাটাকাটি হলো, অবশেষে ওঝার কাছ থেকে বিরাট দাম দিয়ে আরেক জাদু কিনতে রাজি হলো চাখার সিং। তার নাম রাখা হলো চণ্ডী।

চণ্ডী আসার পর মাত্র একবার চুরি হয়েছে ওয়্যারহাউসে। পরদিন লিলঙ্গুয়ে হাসপাতালে মারা যায় চোর। তার খুলির সবটুকু চামড়া টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, পেট ফেড়ে বের করা হয়েছিল নাড়িভুঁড়ি। সমস্যার স্থায়ী সমাধান এনে দেয় চণ্ডী।

এক প্রান্তের একটা পথ দিয়ে ফেন্স-এর ভেতর গাড়ি নিয়ে ঢুকল চাখার সিং। বেড়াটা এখনও ভাল আছে, এমন কি কর্নার পোস্টে আটকানো বেবুনের খুলিগুলো এখনও ভয় দেখিয়ে হাসছে। তবে ইনফ্রা-রেড অ্যালার্ম অদৃশ্য হয়েছে। ওটা এক জাম্বিয়ান খদ্দেরের কাছে চড়া দামে বেচে দিয়েছে চাখার সিং। চণ্ডী আসার পর ওটার আর কোন দরকার ছিল না।

বেড়ার সবটুকু ঘুরে দেখার পর ওয়্যারহাউসের পিছনে ক্যাডিলাক থামাল চাখার সিং। পাশেই রয়েছে মেইন বিল্ডিঙের মত করোগেটেড শিট দিয়ে ঢাকা একটা পরিচ্ছন্ন শেড। বোঝাই যায়, এটা পরে কোন এক সময় তৈরি করা হয়েছে, ওয়্যারহাউসের পিছনের দেয়ালের সঙ্গে জোড়া দিয়ে।

ক্যাডিলাক থেকে নামার সময় বোটকা একটা গন্ধ ঢুকল চাখার সিং-এর নাকে। শেড-এর একমাত্র জানালা দিয়ে আসছে গন্ধটা। জানালা অনেক উঁচুতে, লোহার মোটা বার লাগানো।

ডেরিসের দিকে ফিরল চাখার সিং। 'আমার চণ্ডী নিরাপদ তো?'

'ছোট্ট খাঁচটায় আছে, বস্, আপনি যেমন হুকুম দিয়েছেন।'

ডেরিস আশ্বস্ত করলেও, দরজার গায়ে ছোট্ট ফুটোটায় চোখ রেখে ভেতরটা দেখে নিল চাখার সিং, তারপর দরজা খুলে শেডে ঢুকল। কামরাটা প্রায় অন্ধকারই বলা যায়, সামান্য আলো আসছে একমাত্র জানালাটা দিয়ে।

বোটকা গন্ধটা এখন তীব্র। তারপর হঠাৎ আবছা অন্ধকার থেকে ভেসে এল রোমহর্ষক গর্জন, নিজের অজান্তেই ঝট করে এক পা পিছিয়ে এল চাখার সিং। 'হায়, ভগবান!' ভয়টা গোপন করার জন্যে কৌতুক করার চেষ্টা। 'আমাদের চণ্ডীর মেজাজ দেখছি আজ খুবই গরম!'

খাঁচার বার-গুলোর পিছনে পায়চারি করছে জানোয়ারটা। গাঢ় একটা আকৃতি, হলুদ চোখ জ্বলজ্বল করছে অন্ধকারে।

'চণ্ডী!' আদর করে ডাকল চাখার সিং। 'আমার প্রিয় চণ্ডী!' দরজার পাশে হাত তুলে আলোর সুইচ অন করল সে। ঠাণ্ডা নীল আলোয় ভরে গেল শেডের ভেতরটা।

খাঁচার ভেতর একটা মাদী চিতাবাঘ কুঁকড়ে পিছিয়ে গেল দেয়ালের দিকে। ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গি নিল, চোখে খুনের নেশা নিয়ে তাকিয়ে আছে লোকগুলোর দিকে, তার ওপরের ঠোঁট ভাঁজ খেয়ে সরে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে দাঁতগুলো।

বিশাল একটা চিতা, নাক থেকে লেজ পর্যন্ত প্রায় সাত ফুট। পাহাড়ী বনভূমি থেকে ধরে আনার পর একবারই ওজন নেয়া হয়েছিল–একশো বিশ পাউণ্ড। যুবা বয়েসে ধরা পড়ে চণ্ডী, তার আগে বুনো ছাগল আর কুকুর মেরে আহার সংগ্রহ করত। ধরা পড়ার দিন কয়েক আগে এক রাখালও তার হাতে নিহত হয়।

'চণ্ডী, তুমি কি খুব রেগে আছো?' জিজ্ঞেস করল চাখার সিং। ঠোঁট আরও ওপরে তুলে খেঁকিয়ে উঠল চণ্ডী। চাখার সিংকে ভাল করে চেনে সে।

'না, যথেষ্ট রেগে নেই,' সিদ্ধান্ত নিল চাখার সিং, সুইচবোর্ডের পাশের র‍্যাক থেকে একটা ইলেকট্রিক প্রড তুলে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হলো চণ্ডীর। ইলেকট্রিক প্রড-এর হুল বা কাঁটা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে তার। চাপা গর্জন তুলে দ্রুত আগুপিছু করতে লাগল, নির্যাতন এড়াবার জন্যে পালাতে চাইছে। ওয়্যারহাউসের মূল দেয়ালের কাছে জাল ঘেরা খাঁচাটা একটা বোতলের গলার মত সরু হয়ে গেছে, এত সরু যে কোনমতে চিতার শরীরটা শুধু ঢুকতে পারবে–একটা টানেল, শেষ হয়েছে ওয়্যারহাউসের গায়ে বসানো ইস্পাতের স্লাইডিং দরজায়।

লম্বা একটা অ্যালুমিনিয়াম পোলের সঙ্গে জোড়া লাগানো রয়েছে প্রডটা, সেটা খাঁচার এক জোড়া বার-এর মাঝখান দিয়ে ভেতরে ঢোকাল চাখার সিং, হাত লম্বা করে ছুঁতে চেষ্টা করল চণ্ডীকে। ডিভাইসটাকে এড়াবার জন্যে মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি শুরু করল চণ্ডী, খাঁচার বাইরে থেকে গলা ছেড়ে হেসে উঠল চাখার সিং। বাঘটাকে বোতলের গলায় ঢোকাবার চেষ্টা করছে সে।

তারপর চাখার সিংকে লক্ষ্য করে লাফ দিল চণ্ডী। লোহার বার-এ ধাক্কা খেল সে, থাবা মেরে ভেঙে ফেলতে চাইছে ইস্পাত। সারাক্ষণ আক্রোশে গরগরাচ্ছে। কিন্তু পোলটা অনেক বড়, চাখার সিং তার নাগালের বাইরে থাকল।

সুযোগ পেয়ে চণ্ডীর গলার পাশটায় প্রডের ডগা ঠেকাল চাখার সিং। নীল ইলেকট্রিসিটি ঝলসে উঠল, ব্যথায় কুঁকড়ে গেল চিতা, ছিটকে সরে গিয়ে খাঁচার শেষ মাথার টানেলে ঢুকে পড়ল।

তৈরি হয়েই ছিল চাখার সিং, চণ্ডীর পিছনে জাল লাগানো দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। ফাঁদে আটকা পড়ে গেল চণ্ডী। ওয়্যারহাউসের দেয়ালে বসানো স্টীল হ্যাচ-এ ঠেকে আছে তার নাক, গোড়ালির পিছনে জাল ঘেরা দরজা থাকায় পিছিয়ে আসতে পারবে না। টানেলটা এত নিচু যে ওপর দিকে উঁচু হতেও পারবে না সে, আর এত সরু যে মাথা ফেরানো সম্ভব নয়। যেন পেরেক দিয়ে গেঁথে ফেলা হয়েছে তাকে।

একটা চেরিসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে দরজার কাছাকাছি টেবিলের সামনে চলে এল চাখার সিং। ছোট একটা ইলেকট্রিক শোল্ডারিং আয়রন তুলে নিয়ে ওয়াল সকেটে প্লাগ ঢোকাল সে। প্লাস্টিক মোড়া তার ছাড়তে ছাড়তে টানেল ও চণ্ডীর কাছে এসে দাঁড়াল। বার-এর ভেতর হাত গলিয়ে চণ্ডীর নিতম্ব চাপড়াল সে। ওখানে তার চামড়া মোটা আর মসৃণ। স্পর্শটা এড়াবার কোন উপায় নেই বেচারির। মনে হলো তার গোটা শরীর ফুলে উঠেছে আক্রোশে, হিংস্র গরগর আওয়াজ করছে সারাক্ষণ, ঘাড় বাঁকা করে চাখার সিং-এর হাতটাকে ক্ষতবিক্ষত করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। ইস্পাতের বারগুলো ঘাড় ফেরাতে দিচ্ছে না তাকে।

শোল্ডারিং আয়রনটা উঁচু করে ডগায় থুথু ছিটাল চাখার সিং উত্তাপ পরীক্ষা করার জন্যে। ছ্যাঁৎ করে শব্দ হলো, বাষ্প হয়ে উড়ে গেল থুথু। সন্তুষ্টির হাসি ফুটল ঠোঁটে, বার-এর ভেতর আবার হাত গলাল সে। খপ করে চণ্ডীর লেজটা ধরে ফেলে ওপর দিকে তুলল, ফলে ওটার জননেন্দ্রিয় উন্মোচিত হয়ে পড়ল, পায়ুমুখ সহ।

রাগে অন্ধ হয়ে গেছে চণ্ডী। হিসহিস শব্দ করছে সে। সম্পূর্ণ মেলা থাবা দিয়ে কংক্রিটের মেঝে খামচাচ্ছে। এরপর কি ঘটবে জানে সে, লেজ নামিয়ে স্পর্শকাতর অঙ্গ আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

'সাহায্য করো,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল চাখার সিং। তার পাশে দাঁড়িয়ে চণ্ডীর লেজটা ধরল চেরিস। তার মুঠোর ভেতর সাপের মত মোচড় খাচ্ছে লেজটা।

কপালে চিন্তার রেখা, স্পর্শকাতর মাংস আর গর্তটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল চাখার সিং। অনেকগুলো শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত দেখা যাচ্ছে জায়গাটায়, কোন কোনটা তাজা, ক'দিন হলো শুকিয়েছে। উত্তপ্ত আয়রনটা সাবধানে আগে বাড়াল সে, সদ্য শুকানো ক্ষতগুলোকে এড়িয়ে যাবে। স্পর্শ পাবার আগেই উত্তপ্ত আয়রনের আঁচ পেল চণ্ডী, আশঙ্কায় ও আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল তার পেশী।

'সামান্য একটু, মাই বিউটি,' আশ্বাস দিল চাখার সিং। 'খানিকটা রাগিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। ভাগ্যগুণে আজ রাতে যদি তোমার সঙ্গে মাসুদ রানার দেখা হয়ে যায়, বড় খুশি হই।'

লালচে আয়রনটা চণ্ডীর পায়ুমুখের নরম বৃত্তের গায়ে ঠেকাল চাখার সিং। খানিকটা ধোঁয়া উঠল, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল মাংস আর লোম পোড়ার কটু গন্ধ। তীব্র যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল চিতা, ইস্পাতের বার কামড়াল দাঁত দিয়ে।

ক্ষতটা পরীক্ষা করল চাখার সিং। চর্চার মাধ্যমে হাত পাকিয়েছে সে, তার দেয়া ছ্যাঁকা অসহ্য ব্যথা দেবে অথচ ক্ষতটা শুকিয়ে যাবে এক হপ্তার ভেতর, এবং চণ্ডীর চেহারা বা আচরণে কোন প্রভাব পড়বে না। শোল্ডারিং আয়রন টেবিলে

রেখে দিয়ে এক বোতল ডিজইনফেকট্যান্ট তুলে নিল সে। বোতলে নির্ভেজাল আয়োডিন রয়েছে, গাঢ় হলুদ। তুলোয় আয়োডিন ঢালল সে, তুলোটা চেপে ধরল ক্ষতের ওপর।

এখনও গজরাচ্ছে চণ্ডী, ব্যথায় ঝাঁকি খাচ্ছে তার পেশী। চোখ দুটো বিস্ফারিত, খোলা ঠোঁট থেকে দরদর করে লালা ঝরছে।

'যথেষ্ট হয়েছে, হ্যাচ খুলে দাও,' চেরিসকে নির্দেশ দিল চাখার সিং।

চণ্ডীর লেজ ছেড়ে দিল চেরিস। চাবুকের মত সপাং করে শব্দ তুলে লেজটা নেমে এল, দুই পায়ের মাঝখানে সেটাকে ঢুকিয়ে নিল চণ্ডী।

স্টীল হ্যাচের হ্যান্ডেলটা উঁচু করল চেরিস। শেষ একবার গর্জে উঠে ফাঁকটা গলে সামনের দিকে ছিটকে পড়ল চণ্ডী, অদৃশ্য হয়ে গেল ওয়্যারহাউসের ভেতর।

ছ্যাঁকা খাওয়ার পর সারারাত ওয়্যারহাউসের ভেতর পায়চারি করবে চিতা, প্রচণ্ড ব্যথা ও আক্রোশে অস্থির হয়ে থাকবে। ভোর হলে শেডে ফিরে আসবে, খাঁচায় বসে গরগর করবে আর জিভ দিয়ে চাটবে ক্ষতটা। ইলেকট্রিক প্রড-এর সাহায্যে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে তাকে, ভোর হলে এখন আর দেরি করে না, নিজেই চলে আসে খাঁচার ভেতর।

চণ্ডীর পিছনে হ্যাচটা বন্ধ করে দিল চেরিস, মনিবকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল বাইরে। সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল চাখার সিং।

'মেইন গেটে, তুমি তোমার গার্ড হাউসে থাকবে,' চেরিসকে বলল সে। বেড়ার পাশে টহল দিয়ো না কিংবা মাসুদ রানাকে ওয়্যারহাউসে ঢুকতে বাধা দিয়ো না। সে যদি ঢোকে, চণ্ডীই তোমাকে সাবধান করবে।'

হাসল চেরিস, কারণ তার মনিবও হাসছে। শেষবার যে লোকটা ওয়্যারহাউসে ঢুকেছিল তার কথা মনে পড়ে গেছে ওদের। হাসপাতালে মারা যায় লোকটা।

'যখন শুনতে পাবে লোকটার ওপর কাজ শুরু করেছে চণ্ডী, মেইন গেট থেকে ফোন করবে তুমি আমাকে। ফোনটা আমার বিছানার পাশেই থাকবে। আমি না পৌঁছুনো পর্যন্ত ওয়্যারহাউসে ঢুকবে না। এখানে পৌঁছুতে পনেরো কি বিশ মিনিট লাগবে আমার। ততক্ষণে আমার কাজ অনেক কমিয়ে দেবে চণ্ডী।'

বাড়ি ফিরে চাখার সিং দেখল, তার স্ত্রী খাবার নিয়ে বসে আছে। কোথায় গিয়েছিল, কেন গিয়েছিল, এসব কিছুই সে জানতে চাইল না। স্বামীর কোন ব্যাপারেই নাক গলানো তার স্বভাব নয়।

ডিনার খাওয়ার পর দু'ঘণ্টা ধরে ব্যবসার হিসেব পরীক্ষা করল চাখার সিং। প্রতি মাসে অমৃতসরে টাকা পাঠায় সে, ওখানে তার আত্মীয়-স্বজনরা তার নামে জমি কিনে রাখছে।

বিছানায় ওঠার আগে স্টীল সেফ খুলে ডাবল-ব্যারেল টুয়েলভ-বোর শটগানটা বের করল সে, সাথে এক প্যাকেট এসএসজি কার্তুজ। ওর প্রতিটি আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স আছে, সম্ভব হলে আইন মেনে চলা তার স্বভাব।

তার স্ত্রী একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল, তবে কোন মন্তব্য বা প্রশ্ন করল না।

দরজার পাশে অস্ত্রটা রেখে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল চাখার সিং। দশ মিনিট পর ঘুম এসে গেল চোখে।

বিছানার পাশে টেলিফোনটা ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল রাত সোয়া দুটোয়। প্রথমবার রিং হতেই ঘুম ভেঙে গেল চাখার সিং-এর, দ্বিতীয়বার বাজতে শুরু করার আগেই ক্রেডল থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রিসিভার।

'ওয়্যারহাউসের ভেতর ছোট্ট পাখি একটা গান ধরেছে,' অ্যান্টোনি তাকায় বলল চেরিস।

'আমি আসছি,' জবাব দিল চাখার সিং, লাফ দিয়ে নামল বিছানা থেকে। মাসুদ রানার ক্ষতবিক্ষত শরীরটা কল্পনার চোখে পরিষ্কার দেখতে পেল সে।

***